সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

بسم الله الرحمن الرحيم

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥

সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

প্রকাশনায়ঃ আখীরুজ্জামান গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ

সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ

লেখকঃ হাবীবুল্লাহ মাহমুদ (নাটোরী)

গ্রন্থসত্ত্বঃ আখীরুজ্জামান গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ।

সংকলকঃ জিহাদুল ইসলাম।

কম্পিউটার কম্পোজঃ মুসাফির হাবিব।

প্রথম প্রকাশঃ, ১২ই মে ২০২১ ঈসায়ী, ২৯শে রমাদান, ১৪৪২ হিজরি।

প্রকাশনায়ঃ আখীরুজ্জামান গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ

বাধাইঃ

মুদ্রণঃ

হাদিয়াঃ ৭০ (সত্তর) টাকা মাত্র।

ওয়েবসাইটঃ https://www.gazwatulhind.com, https://dl.gazwatulhind.com/
ফেসবুকঃ https://www.facebook.com/mahmudgazwatulhind/
যোগাযোগঃ anonymoustigers@protonmail.com

SARBABHUM KHOMOTAR MALIK ALLAH BY HABIBULLAH MAHMUD, EDITING JIHADUL ISLAM. PUBLISHED BY AKHIRUJJAMAN GOBESHONA KENDRA, BANGLADESH. COPYRIGHT: PUBLISHER. PUBLISHED: 12TH MAY, 2021 ISAYI, 29TH RAMADAN, 1442 HIJRI.

সংকলকের কথা

আলহামদুলিল্লাহি হামদান কাছীরন ইলা ইয়াউমিদ্দীন আম্মা বা'দ,

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করতেছি যিনি আমাদের ও সব সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক, যিনি ন্যায় বিচারক ও বিচার দিনের মালিক যার সিদ্ধান্তে কোন ভুল নেই এবং তার ওয়াদা সত্য আর তা অতি শীঘ্রই বাস্তবায়িত হবে। লক্ষ কোটি সালাম ও দুরূদ ইমামুল মুরসালীন, খতামুন নাবী'য়ীন হযরত মুহাম্মাদ (ছল্লাললহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি এবং তার পরিবারগণের প্রতি, সাহাবাদের প্রতি, শুহাদাগণের প্রতি ও সত্যের সৈনিকদের প্রতি।

এটাই শেষ জামানা, যেখানে সত্যকে মিথ্যায় আর মিথ্যাকে সত্যে রুপান্তর করা হচ্ছে। মানুষ ডুবে আছে পাপাচারে, অন্ধবিশ্বাসে আর এটাই সেই সময় যখন আল্লাহ আমাদেরকে আযাবের দ্বারা ধ্বংস করে দিবেন। এটা চূড়ান্ত কেয়ামত না হলেও বড় একটি জাতি কেয়ামত হবে। যার ফলে পৃথিবীর তিন ভাগের দুই ভাগ মানুষই মারা যাবে যা হাদিছে উল্লেখ এসেছে এবং তা এসেছে ইমাম মাহদীর আগমনের আলামত হিসেবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা কুরআনে বলেন-

এমন কোন জনপদ নেই, যাকে আমি কিয়ামত দিবসের পূর্বে ধ্বংস করব না অথবা যাকে কঠোর শাস্তি দেব না। এটা তো গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে।

- সূরা বানী-ইসরাঈল (الإسرا), আয়াত: ৫৮

কিন্তু এই ধ্বংস আগের সেই বানী ইসরাঈল জাতি, সামুদ জাতি, 'আদ জাতি আর লুত নাবীর (আঃ) জাতির মত না। আমাদের শেষ নাবী ﷺ এসেছেন আমাদের জন্য রহমত হিসেবে, তাই আমাদেরকে সমূলে ধ্বংস করবেন না। এই আযাব হবে আমাদের দুই হাতের কামাই এর ফলেই। এই আযাব দিবেন আমাদের উপর শত্রু চাপিয়ে দিয়ে। তাদের মাধ্যমেই আমাদের আযাব দিবেন। হাদিছের বর্ণিত সেই ফিতনার যুগ এটাই। আর কিসের অপেক্ষা আযাব আসার? উম্মত বুঝতে বুঝতে অনেক দেরি হয়ে যাবে এবং বেশির ভাগই সতর্ককারীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। সর্বশেষ ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থা ১৯২৪ সালে ধ্বংস হয়ে যায়। আর হাদিছে রয়েছে ইসলামের বড় কোন ক্ষতি হওয়ার ১০০ বছরের

মাথায় তথা প্রতি শতাব্দীতে আল্লাহ একজন মুজাদ্দিদ বা দ্বীন সংস্কারক মনোনীত করে পাঠান। আর সেই সময়টি এখন একদমই নিকটে (২০২১-২০২৪) যখন সেই মুজাদ্দিদ এর আগমন ঘটবে, যিনি ইসলামকে পুনরায় সংস্কার করবেন ও সেই আগের মূল ইসলামে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। তিনি এসেই চূড়ান্ত সতর্কবার্তা জানাবেন। আর আল্লাহ প্রত্যেক জাতিকে আযাব দেওয়ার আগে সেখানে সতর্ককারী পাঠায়। এটাই আল্লাহর নিয়ম। আগামীতে ধেয়ে আসা এই আযাব থেকে বাচতে হলে শিরক, পাপাচার, অন্ধবিশ্বাস, পীরপূজারী ত্যাগ করে ইসলামে পুরোপুরিভাবে ঢুকতে হবে ও পরিপূর্ণ দ্বীন মানতে হবে এবং দ্রুতই সেই সতর্ককারী মুজাদ্দিদকে খুজে বের করতে হবে। যিনি এই উম্মাহর রাহবার হয়ে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করবেন ও এই জাতি কেয়ামত থেকে বাঁচার দিক-নির্দেশনা দিবেন যাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে এই আযাব থেকে মুক্তি দেন। এই মুক্তি যেন হয় দ্বীন ইসলামকে সাহায্য করার মাধ্যমে কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ''যে তার দ্বীনের সাহায্য করবে আল্লাহ তার সাহায্য করবেন!'' সুবহানাল্লাহ!
(আল্লাহ আমাদের সবাইকে এই কথাগুলো বুঝার তৌফিক দান করুন। আমীন।)

''**সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ**'' – শিরোনামে হাবীবুল্লাহ মাহমুদ এর লিখিত আরেকটি বই প্রকাশিত হয়েছে। যেটি পড়ে পাঠকরা বুঝতে পারবেন যে তার এই বইটিও আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান দিয়ে লিখিত হয়েছে। বইটিতে আল্লাহর বড়ত্ব, আল্লাহর ক্ষমতা ও আল্লাহর উপর সঠিক আক্বীদা সম্পর্কে উল্লেখের পাশাপাশি বর্তমান যুগের দ্বীনুল ইসলাম ও দ্বীনুশ শাইতান এর আলোচনা করে হক ও বাতিল চিহ্নিত করে হক থেকে বাতিলকে পুরোপুরি আলাদা করে সবার সামনে তুলে ধরা হয়েছে। যাতে মানুষ সত্যকে দেখে সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে সে হক গ্রহণ করবে নাকি বাতিল পন্থা গ্রহণ করবে। তাই লেখকের এই অমূল্য বইটি মুসলিম উম্মাহর কাছে পৌঁছে দিতে এর সংকলন ও সম্পাদনে খুবই আগ্রহী হই।

- জিহাদুল ইসলাম

http://t.me/anmdak

সূচিপত্র

১। লেখক পরিচিতি....................০৭
২। ভূমিকা....................০৮
৩। **প্রথম অংশঃ** সর্বোচ্চ ও সুমহান তিনি....................১০
৪। **দ্বিতীয় অংশঃ** সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ....................১৪
৫। **(ক)** আল্লাহ তা'য়ালার আকার আছে.................... ১৪
৬। মহান আল্লাহ তা'য়ালা দেখেন ও শোনেন....................১৫
৭। মহান আল্লাহ তা'য়ালা কথা বলেন....................১৫
৮। মহান আল্লাহ তা'য়ালার দুটি চোখ রয়েছে....................১৮
৯। মহান আল্লাহ তা'য়ালার চেহারা রয়েছে....................১৯
১০। মহান আল্লাহ তা'য়ালার দুটি হাত রয়েছে....................২০
১১। যারা মহান আল্লাহ তা'য়ালার হাতকে কুদরতী হাত বলে ব্যাখ্যা করেন তাদের উদ্দেশ্যে....................২১
১২। মহান আল্লাহ তা'য়ালার পা রয়েছে.................... ২৩
১৩। মহান আল্লাহ তা'য়ালার আরশ সপ্ত আসমানের উপর আর আরশের উপর আল্লাহ তা'য়ালা সমুন্নত....................২৩
১৪। মহান আল্লাহ তা'য়ালার আকাশের উপর সমুন্নত হওয়া ও তাঁর মাখলুকের সাথে থাকার বিষয়টির সঠিক সমাধান....................২৯
১৫। **(খ)** সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ....................৩৩
১৬। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা....................৩৬
১৭। শয়তান কী চায়....................৪০
১৮। অস্ত্রযুদ্ধে যখন শয়তান....................৪৫
১৯। দ্বীন অর্থ....................৪৭
২০। দ্বীন ইসলামের সাথে গণতন্ত্রের সাংঘর্ষিক বিষয়....................৫০
২১। অধিকাংশের সমর্থনের কুফল....................৫৩
২২। একটি বহুল প্রচলিত গল্প....................৫৮
২৩। ইসলামের বিধানেই শান্তি....................৬১
২৪। গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা....................৬৩
২৫। একমাত্র মহান আল্লাহ তা'য়ালার সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক....................৭৪
২৬। কেন সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ.................... ৭৫
২৭। দুনিয়ার মানুষের হাতে অস্থায়ীত্ব ক্ষমতা দেবার মালিকও আল্লাহ....................৭৭
২৮। **তৃতীয় অংশঃ** আল্লাহ সর্বশক্তিমান....................৮০

লেখক পরিচিতি

নামঃ মাহমুদ, ডাকনামঃ জুয়েল মাহমুদ, তার স্বজনদের অনেকে তাকে সোহেল নামেও ডাকে এবং তিনি এদেশে "হাবীবুল্লাহ মাহমুদ" নামেই পরিচিত।

পিতাঃ আব্দুল কাদের বীন আবুল হোসেন, এবং জননীঃ সাহারা বিনতে রিয়াজ উদ্দিন।

তার পিতা-মাতার দিক থেকে কয়েক জন উর্ধ্বতন পুরুষের নামঃ

পিতার দিক হতেঃ আব্দুল কাদের বীন আবুল হোসেন বীন আব্দুল গফুর বীন খবীর বীন আব্দুল বাকী বীন নজির বীন মোল্লা আব্দুছ ছাত্তার মুরশিদাবাদী।

মাতার দিক হতেঃ সাহারা বীনতে রিয়াজ উদ্দিন বীন ইব্রাহীম বীন কাসের মোল্লা ওরফে কালু মোল্লা বীন বাহলুল বীন নূরউদ্দিন হেরা পাঠান, যিনি পাকিস্থানের বেলুসকিস্তানের অধিবাসী ছিলেন।

জন্মঃ তিনি ১৪১৬ হিজরীর জুমাদিউল আওয়াল মাসের ৬ তারিখ সকালে নাটোরের বাগাতিপাড়া উপজেলার পাকা ইউনিয়নের অর্ন্তগত উত্তর গাঁওপাড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবনঃ তিনি স্থানীয় সালিমপুর মালিগাছা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখা পড়া করেন। অতঃপর তার নানার সহযোগীতায় স্থানীয় গাঁওপাড়া হাফেজিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং সেখান থেকে কুরআনের নাজরানা শেষ করে কিছু অংশ মুখস্তও করেন তিনি। অতঃপর বড় বাঘা মাদরাসায় ভর্তি হয়ে সেখান থেকে তিনি ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

ভূমিকা

নাহমাদুহু ওয়ানুছল্লি 'আলা রসূলিহিল কারীম। আম্মা বা'দ,

যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'য়ালার জন্য, যিনি সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। যিনি সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা, যিনি জীবন দান করেছেন এবং দিয়েছেন ব্যক্তি স্বাধীনতা, ভালো-মন্দ যাচাই-বাচাইয়ের জন্য। যিনি পুনরুত্থান করবেন এবং হিসাব নিবেন দুনিয়ার জীবনের। যিনি বিচার দিবসের মালিক এবং যিনি সৎকাজের পুরুস্কার দাতা ও অসৎকাজের শাস্তিদাতা। ছলাত ও ছালাম বর্ষিত হোক বিশ্ব মানবতার মুক্তির মহান দূত। যিনি সাইয়েদুল মুরসালিন, ইমামুল মুত্তাক্বিন, আমীরুল মুজাহিদীন ও খতামুন্নাবিইয়িন মুহাম্মাদ ﷺ এর প্রতি যিনি আল্লাহর বান্দা ও শ্রেষ্ঠ রসূল। যাহার আনিত আদর্শ মানা আর না মানার মধ্যে রয়েছে জান্নাত লাভ ও জাহান্নামের ফায়সালা।

অতঃপর, অনেক সাথী ভাইদের দীর্ঘদিনের একটি চাওয়া ছিলো- যেন আমি মহান আল্লাহ তা'য়ালার সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র নিয়ে কিছু লিখি। কিন্তু লেখার মত তেমন কোন পরিবেশ পরিস্থিতি হয়ে উঠেনি। তবুও আমি গত নভেম্বর ২০২০ এর দুই একটি জুমু'আ এর খুৎবায় আলোচনার চেষ্টা করেছি। অতঃপর ২য় বারের জেল বন্দি হওয়ায় আবারো একটি অবসর সময় অতিবাহিত করতে থাকি। কাজেই উল্লেখিত বিষয়টি নিয়ে কিছু কথা লেখার উপযুক্ত সময় মনস্থির করলাম এবং কথাগুলি নিয়ে "সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ" নামে একটি ছোট বই লিপিবদ্ধ করলাম। বইটি লেখতে বন্দি অবস্থায় পর্যাপ্ত গ্রন্থসহযোগীতা না থাকায় হয়তো অনেক মূল্যবান কথাও উল্লেখ করতে পারি নাই। কাজেই বইটি পড়ে পাঠকদের পরামর্শ ভিত্তিক মন্তব্য প্রকাশের জন্য একটি কমেন্ট বক্স নির্ধারিত থাকবে, যার ঠিকানা নিম্নে উল্লেখ করা হবে। অতঃপর সঠিক মন্তব্য গ্রহণের মাধ্যমে বইটির ২য় সংস্কারে সংশোধনী বা সংযুক্ত করা হবে। ইংশাআল্লাহ।

অতঃপর, বইটিতে কুরআনুল কারীমের সূরা মুলকের ১ নং আয়াত হইতে আলোচ্য বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। সেখানে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

সর্বোচ্চ ও সুমহান তিনি, যার হাতে রয়েছে সার্বভৌম ক্ষমতা, তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরা মূলক, আয়াতঃ ১)

উক্ত আয়াতটি আমি ৩ টি ভাগে আলোচনা করেছি।

১। সর্বোচ্চ ও সুমহান তিনি।
২। যার হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা।
৩। তিনি সর্বশক্তিমান।

উক্ত বইটির লেখায় শব্দ গত বা টাইপিংয়ে যদি কোন ভুল পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয় তাহলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং তা পরবর্তী সংশোধনের জন্য উল্লেখিত ঠিকানায় অবগত করিবেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা উক্ত বইটি আমাদের সকলকেই সারমর্ম বুঝে পড়ার ও উত্তম আলোচনাটি আমলে আনার তাওফিক দান করুন। "আমীন"

অতএব, বইটি আমার লেখার শুরু থেকে প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে পাঠকদের হাতে পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত সার্বিক সহযোগীতা করেছেন এবং বিভিন্ন ভাবে শ্রম দিয়েছেন তাদের সকলের গোনাহ মাফ ও নাজাতের জন্য রহমানুর রহীম মহান আল্লাহ তাওয়ালার নিকট দু'আ করি, যেন গফুরুর রহীম আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সকলের গোনাহ মাফ করে দেন এবং সঠিক পথ দানের মাধ্যমে আখিরাতে নাজাত দেন। আল্লাহুম্মা আমীন।

- লেখক

প্রথম অংশ

تَبَارَكَ
সর্বোচ্চ সুমহান তিনি (আল্লাহ)

উক্ত আয়াতের প্রথমাংশে মহান আল্লাহ তা'য়ালা "তাবারক" দ্বারা নিজেকেই বুঝিয়েছেন, যার অর্থ মহামহিমান্নিত মহা মর্যাদা-সম্পন্ন। বারকাত শব্দ থেকেই তাবারক বুঝানো হয়েছে। যার অর্থ অধিক হওয়া, বেশি হওয়া, যেহেতু মহান আল্লাহ তা'য়ালার মান-মর্যাদা, ক্ষমতা, সকল কিছুই সর্বাধিক, সবচেয়ে বেশি, সেহেতু একমাত্র মহান আল্লাহ তা'য়ালাকেই সর্বোচ্চ সুমহান বলা হয়েছে। এছাড়া উক্ত আয়াতের পরেরাংশেই মহান আল্লাহ তা'য়ালার ক্ষমতা সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। সে কারণেও উক্ত আয়াতের প্রথমাংশের তাবারক অর্থাৎ বেশি হওয়া অর্থে মুফাসসিরগণ আল্লাহ তা'য়ালার অধিক ক্ষমতা হওয়াকেও বুঝিয়েছেন। যদি আমরা মহান আল্লাহ তা'য়ালার ক্ষমতা নিয়ে একটু স্থির হয়ে চিন্তা ভাবনা করি এবং সম্মানিত কুরআনের বিভিন্ন আয়াত পর্যালোচনা করি, তাহলেই বুঝতে পারব মহান আল্লাহ তা'য়ালার "অধিক ক্ষমতা" সম্পর্কে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আসমান ও জমিনে যাহা কিছু আছে সব আল্লাহরই এবং সব কিছুকে আল্লাহ পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। (সূরা নিসা, আয়াতঃ ১২৬)

এছাড়াও আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আল্লাহই শস্য-বীজ ও আটি অঙ্কুরিত করেন, তিনিই প্রাণহীন হইতে জীবন্তকে বাহির করেন এবং জীবন্ত হইতে প্রাণহীনকে বাহির করেন। তিনিই তো আল্লাহ; সুতরাং তোমরা কোথায় ফিরিয়া যাইবে। তিনিই উষার উন্মেষ ঘটান, তিনিই বিশ্রামের জন্য রাত্রি এবং গণনার জন্য সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছেন, এ সবই পরাক্রমশালী সর্ব পরিজ্ঞাতার নিরূপন। তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তদ্বারা স্থলের ও সমুদ্রের অন্ধকারে তোমরা পথ পাও। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমি তো নিদর্শন বিশদভাবে বর্ননা করিয়াছি। তিনিই তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদের জন্য দীর্ঘ ও স্বল্পকালীন বাসস্থান রহিয়াছে। অনুধাবনকারী সম্প্রদায়ের জন্য আমি তো নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছি। তিনিই আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর উহা দ্বারা আমি সর্বপ্রকার উদ্ভিদের চারা উদ্‌গম করি;

অতঃপর উহা হইতে সবুজ পাতা উদ্‌গত করি, পরে উহা হইতে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা উৎপাদন করি এবং খেজুর বৃক্ষের মাথি হইতে ঝুলন্ত কাঁদি বাহির করি আর আঙ্গুরের উদ্যান সৃষ্টি করি এবং যায়তুন ও দাড়িম্বও। ইহারা একে অন্যের সদৃশ এবং বিসদৃশও। লক্ষ কর উহার ফলের প্রতি, যখন উহা ফলবান হয় এবং উহার পরিপক্কতা প্রাপ্তির প্রতি। মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য উহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে। (সূরা আনআম, আয়াতঃ ৯৫-৯৯)

অতঃপর মহান আল্লাহ তা'য়ালা ওয়াহীর মাধ্যমে কুরআন মাজীদ এর অন্য এক আয়াতে কাফির মুশরিকদেরকে প্রশ্ন করে আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলেন, বল, কে তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী হইতে জীবনোপকরণ সরবরাহ করে অথবা শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি কাহার কর্তৃত্বাধীন, জীবিতকে মৃত হইতে কে বাহির করে এবং মৃতকে জীবিত হইতে কে বাহির করে এবং সকল বিষয় কে নিয়ন্ত্রণ করে? তখন তাহারা বলিবে, ‘‘আল্লাহ’’। বল, তবুও কি তোমরা সাবধান হইবে না। (সূরা ইউনুস, আয়াতঃ ৩১)

এছাড়াও আমরা কম-বেশি সকলেই অবগত আছি আমাদের মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর কথা, যিনি মহান আল্লাহ তা'য়ালার অধিক ক্ষমতা সম্পর্কে অবগত করিয়াছিলেন তৎকালিন সময়ের কুখ্যাত কাফির সরদার (নমরুদ) কে। অতঃপর বিতর্ককারী কুখ্যাত কাফির সরদার আমাদের জাতির পিতা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর নিকট হতে মহান আল্লাহ তা'য়ালার ‘‘অধিক ক্ষমতার’’ বিষয়ে অবগত হবার পর। হতবুদ্ধি হইয়া গিয়েছিলো। সেই ঘটনাটি মহান আল্লাহ তা'য়ালা কুরআন মাজিদ-এ, উল্লেখ করে বলেন, তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখ নাই, যে ইব্রাহীম এর সঙ্গে তাহার প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হইয়াছিল, যেহেতু আল্লাহ তাকে কর্তৃত্ব দিয়াছিলেন, যখন ইব্রাহীম বলিল, তিনি আমার প্রতিপালক যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। সে বলিল, আমিও তো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই। ইব্রাহীম বলিল, আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক হইতে উদিত করান। তুমি উহাকে পশ্চিম দিক হইতে উদিত করাও তো। অতঃপর যে কুফুরী করিয়াছিল সে হতবুদ্ধি হইয়া গেল, আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (সূরা বাকারাহ, আয়াতঃ ২৫৮)

এছাড়াও মহান আল্লাহ তা'য়ালা অন্য এক আয়াতে তিনার "অধিক ক্ষমতার" বর্ণনা দেন, যা আমাদের জাতির পিতা ইব্রাহীম (আঃ) মহান আল্লাহ তা'য়ালার নিকট হইতে দেখতে চেয়েছিলেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, যখন ইব্রাহীম বলিল, হে আমার প্রতিপালক, কিভাবে তুমি মৃতকে জীবিত কর আমাকে দেখাও। তিনি বলিলেন, তবে কি তুমি বিশ্বাস কর না? সে বলিল, কেন করিব না, তবে ইহা কেবল আমার চিত্ত প্রশান্তির জন্য। তিনি বলিলেন, তবে চারটি পাখি লও। এবং উহাদেরকে তোমার বশীভূত করিয়া লও। অতঃপর তাহাদের এক এক অংশ এক এক পাহাড়ে স্থাপন কর। অতঃপর উহাদেরকে ডাক দাও, উহারা দ্রুত গতিতে তোমার নিকট আসিবে। জানিয়া রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা বাকারাহ, আয়াতঃ ২৬০)

এছাড়াও আমরা যদি কুরআন মাজিদ এর একটি আয়াত স্থিরভাবে বুঝে পড়ি এবং তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করি তাহলেই মহান আল্লাহ তা'য়ালার অধিক ক্ষমতা সম্পর্কে আমরা কিছুটা অবগত হতে পারব। যেখানে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আমি মাটি হইতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছি, উহাতেই তোমাদেরকে ফিরাইয়া দিব এবং উহা হইতে পুনরায় তোমাদেরকে বাহির করিব। (সূরা ত্ব-হা, আয়াতঃ ৫৫)

উক্ত আয়াতটি পড়ে অনেকেই হয়তো কিছুটা হলেও মহান আল্লাহ তা'য়ালার ক্ষমতা সম্পর্কে অবগত হতে পেরেছেন। যা দিনের আলোর মতো সত্য। মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, আবার সেই মাটির নিচেই আমাদেরকে রাখা হবে, আমাদের মৃত লাশ। তখন এই লাশটি গলে পচে গেলেও আবার মহান আল্লাহ তা'য়ালা সেই গলে পচে যাওয়া লাশকেই পূর্ণ মানব আকৃতিতেই কবর থেকে উঠাবেন। আর সেই দিনটিই হবে বিচার-ফায়সালার দিবস। আর সেই দিন কেবল একমাত্র মহান আল্লাহ তা'য়ালার সকল কিছুর মালিক। একমাত্র তিনিই সেই দিনের হুকুমদাতা। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, তিনি বিচার দিবসের মালিক। (সূরা ফাতিহা, আয়াতঃ ৩)

যেই দিনের বিষয় সম্পর্কে আমরা কম-বেশি সকলেই কিছুটা হলেও জানি, সেই দিনটি কত কঠিন। আর এই দিনের ব্যাপারে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, সেই

দিন মানুষ পলায়ন করিবে তাহার ভাই হইতে এবং তাহার মাতা, তাহার পিতা, তাহার স্ত্রী ও তাহার সন্তান হইতে। সেই দিন উহাদের প্রত্যেকের হইবে এমন গুরুতর অবস্থা যাহা তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখিবে। (সূরা আবাছা, আয়াতঃ ৩৪-৩৭)

একটু স্থির হয়ে ভেবে দেখুন, সেই দিনটি কেমন? যেই দিন মানুষ তার আপনদের থেকে পলায়ন করবে। যেই আপনজনের জন্য মানুষ এই দুনিয়াতে এতো ব্যস্ত। যাদের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য, মানুষ নিজেদের মনের সকল আশা আকাঙ্ক্ষাকে পরিত্যাগ করে। তাদের জন্য সময় দিতে গিয়ে মানুষ নিজের রবের ইবাদত করার কথাও ভুলে যায়। আর সেই দিন তারা এই সকল আপনদেরকে ভুলেই মাথা নত করে বিশ্ব জাহানের রব মহান আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে। সেই দিনটা তাহলে কত কঠিন? যেই বিষয়টি নিয়ে আমি পরবর্তীতে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। অতঃপর এক শ্রেণীর মূর্খ অকৃতজ্ঞ মানুষ আছে যারা সেই দিনকে এবং সেই দিনের মালিককে অস্বীকার করে বলে, এটা কেমন গল্প, মানুষ মরে গেলে পচে গেলেও নাকি আবার পুনরায় জীবিত করবে আল্লাহ? নিশ্চয়ই এই মূর্খ অকৃতজ্ঞ মানুষগুলোর একটু চিন্তা-ভাবনা করা উচিৎ। যখন তারা কোন বীজ রোপন করে মাটির নিচে এবং তা গলে-পচে যায়। তখন তা থেকে পুনরায় জীবিত একটি গাছ কিভাবে জন্ম নেয়? যার দৃষ্টান্ত উদাহরণ কদু/লাউ গাছ। যার বীজ মাটিতে রোপন করা হয় এবং সেই বীজকে মানুষের লাশ কবরস্থ করার মতো কবরস্থ করা হয়। অতঃপর তা থেকে পুনরায় জীবিত একটি কদু/লাউ গাছ উদ্গত হয়। (সুবহানআল্লাহ) এই সকল কিছু মহান আল্লাহ তা'য়ালার এক নিদর্শন। আর ক্ষমতাবান আল্লাহ তা'য়ালার অধিক ক্ষমতার এক বাস্তব দৃষ্টান্ত।

দ্বিতীয় অংশ

الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ
সার্বভৌম ক্ষমতা তাঁর (আল্লাহর) হাতে

উক্ত আয়াতের মধ্যমাংশের “আল্লাজি বিয়াদিহিল মুল্‌ক” দ্বারা মহান আল্লাহ তা’য়ালা তাঁর সার্বভৌমত্বের ক্ষমতার কথা বুঝিয়েছেন। যার অর্থ আল্লাজি বিয়াদিহিল- যার হাতে, মুল্‌ক-সার্বভৌমত্বের ক্ষমতা। অর্থাৎ, সার্বভৌম ক্ষমতা তাঁর (আল্লাহর) হাতে / সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ। উক্ত আয়াতাংশে দুইটি বিষয় উল্লেখিত। যথাঃ

ক। আক্বিদাহ সংশ্লিষ্ট বিষয়।

খ। সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ।

যেহেতু আয়াতটি তিলাওয়াতের সময় আক্বিদাহ সংশ্লিষ্ট বিষয়টিই আগে এসে যায়, সেহেতু সেই বিষয়টি নিয়েই প্রথমে আলোচনা করাই যুক্তিসঙ্গত মনে করছি।

ক. আল্লাহ তা’য়ালার আকার আছে

বর্তমান সময়ে মুসলিমদের মাঝে বিভিন্ন আক্বিদাহ/বিশ্বাসের মানুষ বসবাস করলেও ২ টি আক্বিদাহ অবলম্বনকারীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। সেই আক্বিদাহ দুটি মহান আল্লাহ তা’য়ালাকে নিয়ে সংশ্লিষ্ট। যথাঃ

১। আল্লাহর আকার নেই অর্থাৎ আল্লাহ নিরাকার।

২। আল্লাহর আকার আছে অর্থাৎ অঙ্গসম্পন্ন আল্লাহ।

আর এই দুইটি আক্বিদাহ নিয়েই তা গ্রহণকারীগণ নিজেদের স্বপক্ষে দলিল দিয়ে লিখেছে বিভিন্ন পুস্তকাদি। কিন্তু অধিকতর শক্তিশালী ও ছহীহ আক্বিদাহ হলো, অঙ্গসম্পন্ন আল্লাহ। যা উল্লেখিত আয়াতাংশে “বিয়াদিহিল” এর ইয়াদ দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমানিত হয়। যার অর্থ হাত। যেহেতু আল্লাহর তা’য়ালার হাত রয়েছে, সেহেতু অন্যান্য অঙ্গগুলোও থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তবে সেইগুলো অবশ্যই মানুষের মতো নয় এবং তা ধারনাতিতোও নয়। আল্লাহ তা’য়ালা বলেন, কোন কিছুই

তাঁহার অর্থাৎ আল্লাহর সদৃশ নয়। (সূরা শুরা, আয়াতঃ ১১) অতঃপর অধিকতর শক্তিশালী ও সঠিক আক্বিদাহর বিষয়টি এখানে কুরআন ও ছহীহ হাদিছ দ্বারা উল্লেখের চেষ্টা করব। **তবে একটি বিষয় অবশ্যই জানা প্রয়োজন আল্লাহ তা'য়ালার সাথে সংশিষ্ট আক্বিদাহ গ্রহণে যঈফ হাদিছ অবশ্যই বর্জনীয়।**

১ মহান আল্লাহ তা'য়ালা দেখেন ও শোনেন

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, যে নারী তার স্বামীর বিষয়ে তোমার সাথে বাদানুবাদ করেছে এবং অভিযোগ পেশ করেছে আল্লাহর নিকট, আল্লাহ তার কথা শুনেছেন। আল্লাহ তোমাদের উভয়ের কথা শুনেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু দেখেন এবং শোনেন। (সূরা মুজাদালাহ, আয়াতঃ ১)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, তারা কি মনে করে যে আমি তাদের গোপন বিষয় গোপন পরামর্শ শুনিনা? হ্যাঁ, শুনি, আর আমার প্রেরিত দূতগণ তাদের নিকটে থেকে লিপিবদ্ধ করে। (সূরা যুখরুফ, আয়াতঃ ৮০)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সর্বোত্তম উপদেশ দান করেন। আর আল্লাহ সবকিছুই শোনেন এবং দেখেন। (সূরা নিসা, আয়াতঃ ৫৮)

আল্লাহ তা'য়ালা মূসা ও তাঁর ভাই হারুন (আঃ) কে লক্ষ্য করে বলেন, তোমরা ভয় কর না আমি তোমাদের সাথে আছি। আমি শুনি ও দেখি। (সূরা ত্ব-হা, আয়াতঃ ৪৬)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, কোন কিছুই তাঁর সমতুল্য নয়, আর তিনি শোনেন ও দেখেন। (সূরা শুরা, আয়াতঃ ১১)

২ মহান আল্লাহ তা'য়ালা কথা বলেন

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, অনেক রসূল প্রেরণ করিয়াছি, যাহাদের কথা পূর্বে আমি তোমাকে বলিয়াছি এবং অনেক রসূল, যাহাদের কথা তোমাকে বলি নাই। এবং মূসার সাথে আল্লাহ সাক্ষাৎ কথা বলিয়াছিলেন। (সূরা নিসা, আয়াতঃ ১৬৪)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে তোমার রবের কথা পরিপূর্ণ। তার কথা পরিবর্তন করার কেহ নাই, আর তিনি শোনেন ও জানেন। (সূরা আনআম, আয়াতঃ ১১৫)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, এই রসূলগণ, তাহাদের মধ্যে কাহাকেও কাহারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি। তাহাদের মধ্যে এমন কেহ রহিয়াছে যাহার সঙ্গে আল্লাহ কথা বলিয়াছেন, আবার কাহাকেও উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করিয়াছেন। (সূরা বাকারাহ, আয়াতঃ ২৫৩)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, মূসা কে আমি আহবান করিয়াছিলাম তুর পর্বতের দক্ষিণ দিক হইতে এবং আমি অন্তরঙ্গ আলাপে তাহাকে নৈকট্য দান করিয়াছিলাম। (সূরা মারইয়াম, আয়াতঃ ৫২)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, আর সেই দিন আল্লাহ ইহাদের অর্থাৎ কাফিরদের ডাকিয়া বলিবেন, তোমরা রসূলগণকে কি জবাব দিয়াছিলে? (সূরা কাসাস, আয়াতঃ ৬৫)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, তুমি তোমার প্রতি ওয়াহী করা তোমার রবের কিতাব হইতে পাঠ করিয়া শোনাও; তাঁহার কথা পরিবর্তন করিবার কেহ নাই। (সূরা কাহাফ, আয়াতঃ ২৭)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আমিই তোমাদের নিকট উহা প্রেরণ করিব, কিন্তু উহার পর তোমাদের মধ্যে কেহ কুফুরি করিলে তাহাকে এমন শাস্তি দিব, যে শাস্তি বিশ্বজগতের অপর কাহাকেও দিব না। (সূরা মায়িদাহ, আয়াতঃ ১১৫)

অতঃপর, আল্লাহ যখন বলিবেন, হে মরিয়াম পুত্র ঈসা! তুমি কী লোকদেরকে বলিয়াছিলে, তোমরা আল্লাহ ব্যতিত আমাকে ও আমার জননীকে দুই ইলাহ রূপে গ্রহণ কর? সে বলিবে, তুমিই মহিমান্বিত: যদি আমি তাহা বলিতাম তবে তুমি তো তাহা জানিতে। আমার অন্তরের কথা তুমি তো অবগত আছ। কিন্তু তোমার অন্তরের কথা আমি অবগত নই; তুমি অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। (সূরা মায়িদাহ, আয়াতঃ ১১৬)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, যখন তারা সেই গাছের ফল আস্বাদন করলো, তাদের লজ্জাস্থান পরস্পরের সামনে খুলে গেলো এবং তারা নিজেদের শরীর ঢাকতে লাগলো জান্নাতের পাতা দিয়ে। তখন তাদের রব তাদেরকে ডেকে বললেন, আমি কি তোমাদের এ গাছটির কাছে যেতে নিষেধ করিনি। এবং তোমাদের বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? (সূরা আরাফ, আয়াতঃ ২২)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বলিলেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করিতেছি, তাহারা বলিল, আপনি কি সেখানে এমন কাহাকেও সৃষ্টি করিবেন, যে অশান্তি ঘটাইবে ও রক্তপাত করিবে? আমরাই তো আপনার প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষনা করি। তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই আমি যাহা জানি তাহা তোমরা জানো না। (সূরা বাকারাহ, আয়াতঃ ৩০)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, যখন আমি ফেরেশতাদের বলিলাম, আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতিত সকলেই সিজদা করিল, সে অমান্য করিল ও অহংকার করিল। সুতরাং সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হইলো। (সূরা বাকারাহ, আয়াতঃ ৩৪)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আর আমি বলিলাম, হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যেথা ইচ্ছা স্বাচ্ছন্দ্যে আহার কর কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হইও না; হইলে তোমরা অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। (সূরা বাকারাহ, আয়াতঃ ৩৫)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আমি বলিলাম, তোমরা সকলেই এই স্থান হইতে নামিয়া যাও। পরে যখন আমার পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট সৎপথের কোন নির্দেশ আসিবে তখন যাহারা আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করিবে তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না। (সূরা বাকারাহ, আয়াতঃ ৩৮)

উক্ত আয়াতগুলোর সব কয়টিই মহান আল্লাহ তা'য়ালার কথা বলার বিষয়টি প্রমাণ করে অর্থাৎ মহান আল্লাহ তা'য়ালার মুখ রয়েছে। অনুরূপ আরো অনেক আয়াত কুরআন মাজিদ-এ উল্লেখিত হয়েছে।

রসূল ﷺ বলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার সাথে অচিরেই তার রব কথা বলবেন না। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'য়ালা অচিরেই তোমাদের সকলের সাথেই কথা বলবেন। কথা বলার সময় বান্দার মাঝে এবং তার রবের মাঝে কোন দোভাষী থাকবে না। (ছহীহ বুখারী হা: ৭৪৪৩, ৭৫১২)

রসূল ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'য়ালা কিয়ামাতের দিন আদমকে বলবেন, হে আদম! আদম বলবে, আমি তোমার আহবানে সাড়া দিচ্ছি ও তোমার আনুগত্যের উপর সর্বদা সুদৃঢ় আছি এবং তোমার আনুগত্যের জন্য প্রস্তুত রয়েছি। আল্লাহ তা'য়ালা তখন আওয়াজ উঁচু করে এই বলে ডাক দিবেন, আল্লাহ তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমার বংশধর থেকে একদল লোককে বের করে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য। (ছহীহ বুখারী হা: ৭৪৮৩; মুসলিম হা: ২২২)

৩ মহান আল্লাহ তা'য়ালার দুটি চোখ রয়েছে

তোমার রবের ফায়সালা ও হুকুম আসা পর্যন্ত ধৈর্য্য ধারণ কর, নিশ্চয়ই তুমি আমার চোখে-চোখেই আছো। যখন তুমি উঠবে তখন তোমার রবের প্রশংসাসহ তাসবিহ পাঠ কর। (সূরা তুর, আয়াতঃ ৪৮)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আমি নিজের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি ভালোবাসা সঞ্চার করেছিলাম এবং এমন ব্যবস্থা করেছিলাম যাতে তুমি আমার চোখের সামনেই প্রতিপালিত হও। (সূরা ত্বহা, আয়াতঃ ৩৯)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আর নূহ-কে আমি কাষ্ঠফলক ও পেরেক সম্বলিত বহনে আরোহণ করিয়ে দিলাম, যা আমার চোখের সামনেই চলছিলো। এ ছিলো সে ব্যক্তির জন্য প্রতিশোধ, যাকে অস্বীকার করা হয়েছিলো। (সূরা ক্বমার, আয়াতঃ ১৩-১৪)

উপরোক্ত আয়াত গুলো থেকে জানা গেলো যে, তাতে আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালার মর্যাদা ও বড়ত্বের জন্য যেমন দু'টি চোখ শোভনীয়, তাঁর জন্য ঠিক সেরকমই দু'টি চোখ রয়েছে। কুরআনুল কারীমে العين (চোখ) শব্দটি আল্লাহর প্রতি এক বচন ও বহুবচন এই উভয় ভাবেই مضاف (সম্বোধিত) হয়েছে। হাদিছেও এটিকে

আল্লাহর প্রতি দ্বি-বচন হিসাবে সম্বোধিত হয়েছে। দাজ্জালের হাদিছে নাবী ﷺ বলেন, সে সময় আল্লাহর পরিচয় তোমাদের নিকট অস্পষ্ট থাকবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অন্ধ নন। (ছহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুত তাওহিদ হা: ৪৪০২; ছহীহ মুসলিম, অধ্যায়: কিতাবুল ফিতান), একথা বলে নাবী ﷺ তাঁর চোখের দিকে ইঙ্গিত করলেন, এখানে সুস্পষ্ট যে, এই হাদিছ দ্বারা আল্লাহর জন্য এক চোখ সাব্যস্ত করা উদ্দেশ্য নয়। যার চোখ মাত্র একটি সে তো প্রকাশ্য কানা। আল্লাহ তা'য়ালা এই দোষের অনেক উর্ধ্বে।(শারহুল আক্বীদাহ আল-ওয়াসিত্বীয়া- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমীয়া পৃ: ১২৬-১২৭ থেকে হুবহু তুলে ধরা হয়েছে।)

৪ মহান আল্লাহ তা'য়ালার চেহারা রয়েছে

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। একমাত্র তোমার রবের চেহারা অবশিষ্ট থাকবে, যিনি মহিয়ান দয়াবান। (সূরা আর-রহমান, আয়াতঃ ২৬-২৭)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, তাঁর অর্থাৎ আল্লাহর চেহারা ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংস হবে। (সূরা কাছাছ, আয়াতঃ ৮৮)

রসূল ﷺ তাঁর দু'য়ায় বলেছেন, ‘‘আমি মহান আল্লাহর সত্ত্বা, তাঁর সম্মানিত চেহারা এবং তাঁর চিরস্থায়ী ক্ষমতার ওসীলায় বিতারিত শয়তান থেকে আশ্রয় কামনা করছি।’’ (সুনানু আবু দাউদ, হা: ৪৬৬)

আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা নাবী ﷺ আমাদের মাঝে দাড়িয়ে পাঁচটি কথা বললেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা নিদ্রা যান না। নিদ্রামগ্ন হওয়া তাঁর জন্য সমিচীন নয়। তিনি ন্যায় দন্ডের পাল্লা নামান এবং উঠান। দিবসের আমলের পূর্বেই তাঁর নিকট রাতের আমল সমূহ উঠানো হয় এবং রাতের আমলের পূর্বেই দিনের আমল উঠানো হয়। তাঁর পর্দা হচ্ছে নূর। তিনি যদি তা উম্মুক্ত করেন তার চোখের দৃষ্টি যতদূর ততদূর পর্যন্ত সকল মাখলুক তাঁর চেহারার আলোতে জ্বলে যাবে। (উক্ত হাদিছটি শারহুল আক্বিদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া- এর ১২০ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখিত)

উপরোক্ত আয়াত ও হাদিছ দ্বারা মহান আল্লাহ তা'য়ালার চেহারা থাকার কথা প্রমাণিত হয়। "আল্লাহর চেহারা আল্লাহর মতই, যেমন মাখলুকের চেহারা মাখলুকের মতই। আল্লাহর জন্য চেহারা সাব্যস্ত করলে, এই প্রশ্ন করা বোকামী যে, তাহলে কী আল্লাহর চেহারা মানুষের মত? আল্লাহর চেহারা কেমন? এই প্রশ্ন করা যাবে না। যেই আয়াতে আল্লাহর চেহারা সাব্যস্ত করা হয়েছে, তা যেমন সাহাবীগণ শুনেছেন, তেমনি আমরাও শুনছি। তারা যেমন প্রশ্ন ও আপত্তি ছাড়াই মেনে নিয়েছেন, আমাদেরও বিনা প্রশ্নে এতে বিশ্বাস করা ও তা মেনে নেয়া আবশ্যক। সৃষ্টি জগতের সকল প্রাণীর চেহারা যেমন এক রকম নয়; বরং প্রত্যেক প্রানীর জন্যই যেহেতু শোভনীয় চেহারা রয়েছে, তাই স্রষ্টার জন্যও সে রকম চেহারা রয়েছে, যা তাঁর বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয়। তাই দলিলের মাধ্যমে আল্লাহর জন্য যেসব সুউচ্চ গুনাবলী সাব্যস্ত করা হয়েছে, আমরা তা সাব্যস্ত করি। তা আমরা অস্বীকার করি না এবং সৃষ্টির সিদ্ধান্তের সাথে তাঁর সাদৃশ্য হয়ে যাওয়ার অযৌক্তিক ধারণার উপর নির্ভর করে তা অপব্যাখ্যাও করি না।" (উক্ত কথা গুলো শারহুল আক্বিদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া -শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমীয়া (রহ:), পৃষ্ঠা-১১৯ থেকে হুবহু নেওয়া হয়েছে)

⟨৫⟩ মহান আল্লাহ তা'য়ালার দুটি হাত রয়েছে

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, সর্বোচ্চ সুমহান তিনি, যার হাতে রয়েছে সার্ভোমত্ত্বের ক্ষমতা। আর তিনি সকল কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (সূরা মুলক, আয়াতঃ ১)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আর ইহুদিরা বলে, আল্লাহর হাত বাঁধা হয়ে গেছে। তাদের হাতই বাধা হয়ে গেছে। একথা বলার কারণে তাদের উপর অভিসম্পাত করা হয়েছে। বরং তাঁর উভয় হস্ত সদা উম্মুক্ত। তিনি যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করেন। (সূরা মায়িদা, আয়াতঃ ৬৪)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, হে ইবলীস! যাকে আমি নিজের দুই হাতে সৃষ্টি করেছি তাঁর সম্মুখে সিজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি অহংকার করলে? না, তুমি তাঁর চেয়ে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন? (সূরা ছোয়াদ, আয়াতঃ ৭৫)

নাবী ﷺ বলেন, আল্লাহর ডান হাত পরিপূর্ণ। রাত দিন খরচ করার পরেও তাতে কমতি হয় না। তোমরা কি বলতে পারবে আসমান-জমিন সৃষ্টি করার সময় হতে এ পর্যন্ত কত খরচ করেছেন? তাঁর ডান হাতে যা আছে, তা হতে কিছুই কমেনি। তাঁর আরশ ছিল পানির উপর। তাঁর অপর হাতে রয়েছে দাড়িপাল্লা। তিনি উহা উঠান এবং নামান।

নাবী ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর মুঠোতে এবং আসমান সমূহ থাকবে তাঁর ডান হাতে। অতঃপর তিনি বলবেন, আমিই বাদশা।

নাবী ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'য়ালা যখন সৃষ্টিজীব সৃষ্টি করলেন তখন নিজ হাতে লিখে দিলেন যে, আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর জয়লাভ করেছে।

আদম ও মূসা (আঃ) এর পরস্পর ঝগড়ার কথা হাদিছে এসেছে। আদম (আঃ) বললেন, তুমি মূসা। তোমাকে বাক্যালাপের জন্য লোকদের মধ্য হতে মনোনীত করেছেন এবং নিজ হাতে তিনি তোমার জন্য তাওরাত কিতাব লিপিবদ্ধ করেছেন।

এখানে আল্লাহর বাক্যালাপ ও তাঁর হাত এটি ছিফাতে জাতিয়া তথা সত্বাগত গুন। কথা বলা একই সাথে ছিফাতে জাতিয়া তথা সত্বাগত গুন ও ছিফাতে ফেলীয়া তথা কর্মগত গুন। তাওরাত লেখা এটি হচ্ছে আল্লাহর কর্মগত গুন। (উল্লেখিত কথাগুলো শারহুল আক্বিদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া -শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমীয়া (রহি:) এর পৃষ্ঠা ১২৪ থেকে হুবহু নেওয়া হয়েছে)

যারা আল্লাহর হাতকে কুদরতী হাত দ্বারা ব্যাখ্যা করেন তাদের উদ্দেশ্যেঃ

১। যারা বলেন, আল্লাহর কোন হাত নেই; বরং হাত বলতে আল্লাহর কুদরতকে বুঝানো হয়েছে, তাদের কথা সঠিক নয় বরং কুরআন এর আয়াত পরিবর্তনের শামিল, কারণ কুরআনের আয়াত থেকে যে অর্থ সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, কোনরূপ পরিবর্তন ছাড়াই তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করা অপরিহার্য। এটাই সাহাবী, তাবেয়ী এবং পরবর্তী যুগের সমস্ত আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বিদাহ।

২। হাত দ্বারা যদি কুদরত তথা ক্ষমতা উদ্দেশ্য হতো তাহলে আদম (আঃ) কে বিশেষভাবে দুই হাত দিয়ে সৃষ্টি করার কথা বলার কোন প্রয়োজন ছিলনা। কেননা

আল্লাহ তা'য়ালা সমস্ত মাখলুককে এমনকি ইবলীসকেও কুদরতের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। যদি আদম (আঃ) কে নিজ হাতে সৃষ্টি না করে থাকেন তাহলে একথা বলার কোন বৈশিষ্ট্য নেই যে, ‘‘আমি নিজ হাতে যাকে সৃষ্টি করেছি তাঁর সম্মুখে সিজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল?

৩। যদি হাত দ্বারা কুদরত উদ্দেশ্য হয় তাহলে আল্লাহর কুদরত তথা ক্ষমতা দু'টির মাঝে সীমিত হয়ে যাওয়া আবশ্যক হয়ে যায়। কারণ (يد) ইয়াদ তথা হাত শব্দটি দ্বিবচন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, যেহেতু আল্লাহর ক্ষমতা দু'টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় সেহেতু এখানে আল্লাহর প্রকৃত হাতকেই বুঝানো হয়েছে।

৪। হাত বলতে ক্ষমতা কেবল তাঁর ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যেতে পারে। যার প্রকৃত পক্ষেই হাত রয়েছে। এ কথাতো কখনও বলা হয় না যে, ‘‘এ ব্যাপারে বাতাসের হাত আছে’’। কারণ বাস্তবে বাতাসের কোন প্রকৃত হাত নেই। তাই রূপকার্থে বাতাসের জন্য হাত সাব্যস্ত করা শোভা পায় না।

৫। যারা বলে হাত অর্থ কুদরত ও ক্ষমতা উদ্দেশ্য। তাদের কাছে জানার বিষয় হলো যে হাদিছে আল্লাহর আঙ্গুলের কথা বলা হয়েছে তারা সে হাদিছের কি ব্যাখ্যা দিবেন? আমরা কী কখনো এরকম কথা ব্যবহার করি যে, ‘‘এ ব্যাপারে আমার আঙ্গুল আছে?’’

ছহীহুল বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, ইহুদীদের একজন পন্ডিত নাবী ﷺ এর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মাদ! আমরা তাওরাতে পেয়েছি যে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন এক আঙ্গুলে রাখবেন সমস্ত জমিনকে, এক আঙ্গুলে রাখবেন সমস্ত গাছপালাকে, এক আঙ্গুলে রাখবেন সমস্ত পানি ও কাঁদাকে, এক আঙ্গুলে রাখবেন অবশিষ্ট সমস্ত মাখলুককে। ইহুদির একথা সমর্থন করে নাবী ﷺ হাসলেন। এমনকি তাঁর দাঁতগুলো প্রকাশিত হলো। অতঃপর নাবী ﷺ আল্লাহর এই বাণী তিলাওয়াত করলেন, ‘‘তারা আল্লাহর যথাযোগ্য বড়ত্ব ও মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারেনি। কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর মুঠোতে এবং আসমান সমূহ থাকবে ভাঁজকৃত অবস্থায় তাঁর ডান হাতে। তিনি পবিত্র আর তারা যাকে শরীক করে তিনি তা থেকে অনেক ঊর্ধ্বে।’’ (সূরা যুমার, আয়াতঃ ৬৭)

(উপরোক্ত ৫টি পয়েন্ট সবগুলোই শারহুল আক্বিদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া -শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহি:) এর পৃষ্ঠা ১২৪ থেকে নেয়া হয়েছে)

〈৬〉 মহান আল্লাহ তা'য়ালার পা রয়েছে

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, (স্মরণ কর) যেদিন পায়ের গোছা উন্মোচন করা হবে এবং তাদেরকে সিজদা করার জন্য আহবান করা হবে; কিন্তু তারা তা করতে সক্ষম হবে না। (সূরা ক্বলাম, আয়াতঃ ৬৮)
আয়াতের তাফসীরে ছহীহ হাদীসে স্পষ্ট এসেছে যে, এখানে মহান আল্লাহর "পায়ের গোছা" বোঝানো হয়েছে।

নাবী ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা নিজ পায়ের গোছা উন্মোচন করবেন (যেভাবে উন্মোচন করা তাঁর সত্তার জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ)। তখন প্রতিটি মু'মিন নর-নারী তাঁর সামনে সিজদায় পড়ে যাবে। তবে তারা সিজদা করতে পারবে না, যারা দুনিয়াতে লোক দেখানো বা সুনাম লাভের জন্য সিজদা করত। তারা সিজদা করতে চাইবে; কিন্তু তাদের পিঠ পাটার মত এমন শক্ত হয়ে যাবে যে, তা ঝুঁকানো সম্ভব হবে না। (ছহীহুল বুখারী, সূরা ক্বালামের ব্যাখ্যা অধ্যায়, হা: ৪৯১৯)

নাবী ﷺ বলেন, জাহান্নামে অপরাধীদেরকে নিক্ষেপ করা হইতে থাকবে। জাহান্নাম বলবে, আরো আছে কী? তখন মহান রব্বুল আ'লামীন জাহান্নামে নিজের পা রাখবেন। এতে জাহান্নাম সঙ্কুচিত হয়ে যাবে এবং বলবেঃ যথেষ্ট হয়েছে! যথেষ্ট হয়েছে! (ছহীহুল বুখারী অধ্যায়, আইমান ওয়ান্ নুযূর, হা: ৬৬৬১)

〈৭〉 মহান আল্লাহ তা'য়ালার আরশ সপ্ত আসমানের উপর আর আরশ এর উপর আল্লাহ তা'য়ালা সমুন্নত

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। তিনি আসমান ও জমিনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন। (সূরা আরাফ, আয়াতঃ ৫৪)

আল্লাহ ত'য়ালা বলেন, নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, তিনি আসমান-জমিনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন। (সূরা ইউনুস, আয়াতঃ ৩)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আল্লাহই উর্ধ্বদেশে আকাশমণ্ডলী স্থাপন করেছেন বিনা স্তম্ভে তোমরা এটা দেখছো, অতঃপর তিনি আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন। (সূরা রা'দ, আয়াতঃ ২)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, দয়াময় আল্লাহ আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন। (সূরা ত্বহা, আয়াতঃ ৫)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, তিনিই ছয়দিনে আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী এবং তাদের মাঝখানে যা কিছু আছে সব তৈরি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন; তিনি পরম দয়াময়। (সূরা ফুরক্বন, আয়াতঃ ৫৯)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আল্লাহই আসমান-জমিন এবং এতোদুভয়ের মধ্যবর্তী সকল বস্তু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন। (সূরা সাজদা, আয়াতঃ ৪)

উক্ত আয়াতগুলো থেকে এটাই সুস্পষ্ট প্রমানিত হয় যে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা আরশের উপরে সমুন্নত হয়ে আছেন। আর তা সকল আক্বিদাহ অবলম্বন কারীগণই স্বীকারও করে বটে। কিন্তু সমস্যা হলো কিছু কিছু মানুষের আক্বিদাহ- মহান আল্লাহ তা'য়ালা সকল স্থানেই সর্ব অবস্থায় বিরাজমান আবার তাদের অধিকাংশেরই আক্বিদাহ আল্লাহর আরশ মু'মিনের কলবে আর তার সাথে যদি এটাও বিশ্বাস করে যে, এ কারণে মহান আল্লাহ তা'য়ালার জমিনেও উপস্থিত থাকা জরুরী তবে, এটা অবশ্যই একটি ভ্রান্ত ধারণা। এবং কুরআন সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক। আল্লাহর আরশ মু'মিনের কলবে, উক্ত কথাটির দলিল দিয়ে অনেক পীর-ফকিররাও তাদের ভক্তদের নিকট নিজেকে আল্লাহ প্রমানের জঘন্য চেষ্টা করে। আর সরলপ্রান মুসলমানরা তা বিশ্বাস করে পথভ্রষ্ট হয়ে, শিরককারীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। যাদের বিষয়ে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, তাদের অধিকাংশ আল্লাহকে বিশ্বাস করে, কিন্তু তারা মুশরিক। (সূরা ইউসুফ, আয়াতঃ ১০৬)

কিন্তু প্রকৃত বিষয় হলো মহান আল্লাহ তা'য়ালা আসমানে রয়েছেন এবং সেখান থেকেই তিনি তাঁর ইলম ও ক্ষমতা দ্বারা আসমান ও জমিন এর সকল কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন। আর মহান আল্লাহ তা'য়ালা যে আসমানে থেকেই তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতা দ্বারা সকল কিছু পরিচালনা করে থাকেন। তা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। এমন কি অতীতের অনেক কাফির সরদাররাও তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, যে বিষয়ে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, ফেরাউন বলল, হে হামান! আমার জন্য একটি সুউচ্চ ইমারত নির্মাণ করো যাতে আমি রাস্তা সমূহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারি অর্থাৎ আসমানের রাস্তা এবং মূসার আল্লাহকে উকি দিয়ে দেখতে পারি। মূসাকে মিথ্যাবাদী বলেই আমার মনে হয়। এভাবে ফেরাউনের জন্য তার হুকুমসমূহ শোভনীয় করে দেয়া হয়েছে এবং সোজা পথ থেকে ফিরিয়ে রাখা হয়েছে। ফেরাউনের সমস্ত চক্রান্ত ধ্বংসের পথেই ব্যয়িত হয়েছে। (সূরা মু'মিন (গাফির), আয়াতঃ ৩৬-৩৭)

উক্ত আয়াতটি দেখে হয়তো তাদের অনেকেই এমন মন্তব্যও করতে পারেন যে, ফিরাউন মূসা (আঃ) কেও তুচ্ছ্য-তাচ্ছিল্য করে উপহাস করেন যে মূসা এর আল্লাহ আসমানে থাকেন। সুতরাং উক্ত দলিলটিতে আল্লাহর আসমানে থাকার দলিলটি গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের উক্ত কথার জবাবে কুরআন মাজিদ এ আরো অনেক দলিল রয়েছে, যা প্রমান করে আল্লাহ তা'য়ালার আসমানে সমুন্নত থাকার বিষয়টি এবং মহান আল্লাহ তা'য়ালা সেখান থেকেই আসমান জমিনের সকল কিছুকে তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতা দ্বারা পরিবেষ্টন করে আছেন। তবুও আমি হাদিছ থেকে মহান আল্লাহ তা'য়ালার সৃষ্টি ক্ষুদ্র জীব এর আক্বিদাহ উল্লেখ করব যে, আল্লাহ তা'য়ালা কোথায় থেকে সকল কিছু পরিচালনা করেন। ‘‘আল্লাহর নাবী সুলাইমান বীন দাউদ (আঃ) একদা তাঁর অনুসারীদেরকে নিয়ে আল্লাহর কাছে বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য বের হলেন। পথিমধ্যে তিনি দেখলেন একটি পিঁপড়া চিৎ হয়ে পিঠের উপর শয়ন করে আকাশের দিকে পাগুলো উঠিয়ে আল্লাহর কাছে এই বলে বৃষ্টি প্রার্থনা করছে, হে আল্লাহ! আমরা তোমার এক সৃষ্টি। তোমার বৃষ্টির (রহমতের) পানি ছাড়া আমাদের বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। পিঁপড়ার এই কথা শুনে তিনি ফেরত আসছিলেন। অনুসারীরা তাকে ফেরত আসার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তোমরা ফেরত যাও। কারণ অন্যদের দু'আ এর বদৌলতেই তোমরা

বৃষ্টিপ্রাপ্ত হবে। তারা বলল, আমরা তো কাউকেও দু'আ করতে দেখিনি। তখন তিনি তাদেরকে আকাশের দিকে পা উঠিয়ে একটি পিঁপড়ার আল্লাহর কাছে বৃষ্টি চেয়ে দু'আ করার কথা জানালেন।" (সুবুলুস সালাম, হা: ৪৮৬)

এছাড়াও মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, যখন আল্লাহ বললেন, হে ঈসা! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে মৃত্যু (নিদ্রা) দান করবো। অতঃপর তোমাকে আমার দিকে উঠিয়ে নিবো। (সূরা আল-ইমরান, আয়াতঃ ৫৫)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, বরং আল্লাহ তাকে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন। আল্লাহ প্রবল শক্তিধর ও প্রজ্ঞাবান। (সূরা নিসা, আয়াতঃ ১৫৮)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, পবিত্র বাক্যসমূহ তাঁরই দিকেই উঠে এবং সৎকর্মকে তিনি উন্নীত করেন। (সূরা ফাতির, আয়াতঃ ১০)

উক্ত আয়াতগুলোতে এই কথাটিই প্রমাণিত হয় যে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা আসমানে থাকেন। একারণেই জমিন থেকে ঈসা (আঃ) কে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাছাড়াও মানুষের সৎকর্ম ও পবিত্র কালিমাগুলো জমিন থেকে উপরে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার কারণ একই। আর আল্লাহ তা'য়ালা যদি মু'মিনের কলবে বা সর্বাবস্থায় জমিনে উপস্থিত থাকতেন তবে এই সকল গুলোকে উপরে উঠিয়ে নিয়ো যাওয়ার কোন কারণই ছিলো না। তাছাড়াও আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "রফা আ'হুল্ল-হু ইলাইহি" অর্থাৎ তাকে আল্লাহ উঠিয়ে নিয়েছেন নিজের দিকে। (সূরা নিসা, আয়াতঃ ১৫৮)

যখন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "ঈসাকে আমার দিকে উঠিয়ে নিয়েছি" আর যদি কেও বলেন, আল্লাহ জমিনে থেকেই তাকে উঠিয়ে নেবার কথা বলেছেন এটা অব্যশই সেই ব্যক্তির বুঝার ভুল এবং অযৌক্তিক কথা হবে। আমি সেটা বুঝানো জন্য নিচে একটি গল্পের উদাহরণ উল্লেখ করছিঃ

একজন ব্যক্তি ৪ তলা বিশিষ্ট বাড়ির মালিক বাড়ির ছাদের উপর দাড়িয়ে আছেন, আর সেই বাড়ির সামনে দিয়ে একটি রাস্তা রয়েছে। অতঃপর সেই রাস্তার উপরে দাড়িয়ে এক পথিক, বাড়ির মালিকের সঙ্গে কথা বলার জন্য অনুমতি চান। বাড়ির

মালিক পথিকটিকে বলেন উঠে এসো। অতঃপর মালিকটি ছাদে বসে থাকেন। তাহইলে পথিকটি কোথায় যাবেন? অবশ্যই সেই বাড়ির ছাদের দিকেই তিনি উঠে যাবেন। অতএব, হযরত ঈসা (আঃ) যেহেতু জমিনেই বসবাস করতেন, সেহেতু তাকে জমিন থেকেই উপরে উঠানোর কথা এই জন্যই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'য়ালা উপরে থাকেন। এছাড়াও মহান আল্লাহ তা'য়ালা কুরআন মাজিদ এ স্পষ্ট করে বলেন, তোমরা কি ইহা হইতে নির্ভয় হইয়াছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদেরকে সহ ভূমিকে ধ্বসিয়ে দিবেন না, আর ওটা আকস্মিকভাবে থর থর করে কাঁপতে থাকবে? অথবা তোমরা কি ইহা হইতে নির্ভয় হইয়াছ যে, আকাশে যিনি রহিয়াছেন তিনি তোমাদের উপর কঙ্করবর্ষী ঝঞ্ঝা প্রেরন করিবেন না? তখন তোমরা জানিতে পারিবে কীরূপ ছিলো আমার সতর্কবাণী। (সূরা মুলক আয়াতঃ ১৬-১৭)

উক্ত আলোচনার পর যদি কেও বলে, বুঝে নিলাম আল্লাহ আসমানে থাকেন। তা হইলে এই আয়াতের কি হবে? যেখানে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন ভয় করো না, আমি তোমাদের সাথে আছি। (সূরা ত্বহা, আয়াতঃ ৪৬)

অথবা আল্লাহ তা'য়ালা যেখানে বলেছেন, তুমি কি ভেবে দেখনি যে, আসমান-জমিনে যা কিছু আছে আল্লাহ তা জানেন। তিন ব্যক্তির এমন কোন পরামর্শ হয় না যাতে তিনি চতুর্থ হিসাবে না থাকেন এবং পাঁচ জনের হয় না, যাতে ষষ্ঠ না থাকেন। তাদের সংখ্যা এর চেয়ে কম হোক বা বেশী হোক, তারা যেখানেই থাকুক না কেন তিনি তাদের সাথেই, তারা যা করে তিনি কিয়ামতের দিন তা তাদেরকে জানিয়ে দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। (সূরা মুজাদালাহ, আয়াতঃ ৭)

উক্ত আয়াত গুলোতে আল্লাহ তাঁর বান্দার সাথে থাকার বিষয়টা মহান আল্লাহ তা'য়ালার আকাশে থাকার বিষয়ের সাথে কখনোই সাংঘর্ষিক নয়। বরং তাতে মহান আল্লাহ তা'য়ালার ক্ষমতা ও মর্যাদাই বৃদ্ধি পায়। উক্ত আয়াতগুলো দিয়ে মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাদের সাথে থাকেন, একথা প্রমান করতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা সর্বদা জমিনে উপস্থিত থাকবেন এটা শর্ত নয়, বরং মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতার মাধ্যমে সকল মাখলুককে পরিবেষ্টন করে আছেন।

অর্থাৎ আল্লাহ তা’য়ালা তাঁর সকল সৃষ্টি থেকে অনেক উর্ধ্বে আছেন। আর সেখান থেকেই মহান আল্লাহ তা’য়ালা তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতা দিয়ে সকল কিছু দেখেন ও শোনেন। দুনিয়ার কোন কিছুই তাঁর কাছে অসম্ভব নয়। একটি বার চিন্তা করে দেখুন। যদি মহান আল্লাহ তা’য়ালা আসমান জমিন সৃষ্টি করে সর্বাবস্থায় জমিনেই উপস্থিত থাকতেন, তবে নিশ্চয়ই আসমান তাঁর উপরে থাকত। তাতে শয়তান প্রচার করার সুযোগ পেত আল্লাহ আসমানের নিচে থাকেন, আর আল্লাহর উপরেও অনেক কিছু রয়েছে। (নাউযুবিল্লাহ) তাছাড়াও মহান আল্লাহ কোথায় থাকেন এবং এই আয়াতগুলোর সঠিক মর্ম আল্লাহর রসূল ﷺ স্পষ্টভাবেই জানতেন। আর তিনি ﷺ রোগীকে ঝাড়-ফুঁক করার সময় বলেছেন, তিনিই আমার রব, যিনি আকাশে রয়েছেন। হে আমারদের রব! তোমার নাম পবিত্র। তোমার হুকুমে আসমানে ও জমিনে, আসমানে যেমন তোমার রহমাত রয়েছে তেমনি জমিনেও তোমার রহমাত নাযিল করো। আমাদের গুনাহ ও ভুল-ত্রুটি সমূহ ক্ষমা করো। তুমি পবিত্রদের প্রতিপালক। তোমার নিকট হতে রহমত নাযিল করো এবং তোমার শিফা হতে শিফা নাযিল কর। নাবী ﷺ বলেন, যে এই দু’আ পাঠ করবে, আল্লাহর ইচ্ছায় সে সুস্থ হবে ইংশাআল্লাহ। (আবু দাউদ অধ্যায়: কিতাবুত তিব্ব, হা: ৩৮৯২)

আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা:) বলেন, আমরা একদা নাবী ﷺ এর সাথে খোলা ময়দানে বসা ছিলাম। তখন আমাদের মাথার উপর দিয়ে একটি মেঘখণ্ড অতিক্রম করার সময় তিনি বললেন, তোমরা কি জান এটি কী? আমরা বললাম এটি মেঘ। অতঃপর তিনি বলেলেন, তোমরা কী জান আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানের দূরত্ব কত? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই অধিক জানেন। তিনি বললেন, উভয়ের মধ্যে রয়েছে পাঁচশত বছরের দূরত্ব। এমনকী প্রত্যেক আকাশ ও তার পরবর্তী আকাশের মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশত বছরের পথ। এভাবে সপ্তম আকাশের উপর রয়েছে একটি সাগর। সাগরের গভীরতা হচ্ছে আকাশ আর জমিনের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। সাগরের উপর রয়েছে আটটি পাহাড়ী পাঠা (পাঠার আকৃতিতে ফেরেশতা)। তাদের হাটু থেকে পায়ের খুর পর্যন্ত দূরত্ব আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। তারা আল্লাহর আরশ পিঠে বহন করে আছে। আরশ এতো বিশাল যে তার উপরের অংশ থেকে নীচের অংশের দূরত্ব হচ্ছে আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। আর আল্লাহ

তা’য়ালা রয়েছেন আরশের উপরে। তিনি তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন। (সুনান ইবনু মাজাহ, হা: ১৯৩)

একটি দাসীকে রসূল ﷺ জিজ্ঞেস করেছিলেন, আল্লাহ কোথায়? সে জবাবে বলে দিল, আসমানের উপর। রসূল ﷺ তাকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, আমি কে? সে বলল, আপনি আল্লাহর রসূল। তিনি তখন দাসীর মনিবকে বললেন, তুমি একে আযাদ করে দাও। কারণ সে মুমিন। (ছহীহ মুসলিম হা: ৫৩৭)

উক্ত হাদিছগুলো থেকে একথাটিই সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা’য়ালা তাঁর সকল মাখলুকের উপরে অর্থ্যৎ আসমানের উপরে থাকেন।

মহান আল্লাহ তা’য়ালা আকাশের উপরে সমুন্নত হওয়া ও তাঁর মাখলুকের সাথে থাকার বিষয়টির সঠিক সমাধানঃ

উবাদাহ ইবনে সামেত (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেন, সর্বোত্তম ঈমান হলো তুমি জানবে যে, যেখানেই থাকনা কেন, আল্লাহ তোমাদের সাথেই। (তাবরানী-মু’জামুল কাবীর)

রসূল ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ যখন ছলাতে দাঁড়াবে, তখন সে যেন তার সামনে দিকে থুথু না ফেলে, এমন কি ডান দিকেও না, কেন না আল্লাহ তা’য়ালা তাঁর সামনে রয়েছেন। একান্ত যদি থুথু ফেলতেই হয় তাহলে বাম দিকে অথবা বাম পায়ের নীচে ফেলবে। (ছহীহুল বুখারী হা: ৪১৬; মুসলিম হা: ৫৪৮)

ছাহাবীগণ যখন আল্লাহর যিকির করার সময় তাদের আওয়াজ উঁচু করলেন তখন আল্লাহ রসূল ﷺ বললেন, হে লোক সকল! তোমরা নিজেদের জন্য সহজ পন্থা অবলম্বন করো। কেন না তোমরা তো বধির বা দূরে অবস্থানকারী কাউকে আহবান করছো না। যাকে তোমরা আহবান করছো তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা এবং অতি নিকটে। তোমাদের কেউ বাহনে আরোহন করা অবস্থায় তার বাহনের ঘাড়ের যত নিকটবর্তী থাকে, তোমরা যাকে আহবান করছো, তিনি তার চেয়েও আহবানকারীর অধিক নিকটে। (ছহীহ মুসলিম, অধ্যায় কিতাবুয যিকির ওয়াদ দু’আ, হা: ২৭১৩)

উক্ত হাদিছ সমূহের ব্যাখ্যায়- শারহুল আক্বিদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া এর ব্যাখ্যাকার ড. সালেহ আল ফাওযান বলেন, ‘‘আফদ্বোলুল ই-মা-ন’’ -সর্বোত্তম ঈমান অর্থাৎ ঈমানে বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম বৈশিষ্ট হচ্ছে তুমি যেখানেই থাক না কেন, এই কথা বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ তোমার সাথেই। পূর্বোক্ত কথার মধ্যে দলীল পাওয়া যায় যে, ঈমানের তারতম্য হয়। অর্থাৎ সকল মুমিনের ঈমান এক সমান নয়। ‘‘আং তা’লামা আন্নালা-হা মা আ’কা- তুমি জানবে যে আল্লাহ তোমার সাথেই অর্থাৎ ইলমের মাধ্যমে এবং তোমার যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার মাধ্যমে তিনি তোমার সাথেই, তুমি যেখানেই থাকো না কেন। যে ব্যাক্তি ইহা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে, তার ভিতর ও বাহির একই রকম হবে এবং সকল স্থানেই আল্লাহ তা’য়ালাকে ভয় করে চলবে।’’ পরবর্তী হাদিছের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, ‘‘ইজা-ক্ব-মা আহাদুকুম ইলাছ ছলা-তী -তোমাদের কেউ যখন ছলাতে দাঁড়ায় অর্থাৎ ছলাত শুরু করে, তখন সে যেন সামনের দিকে থুথু না ফেলে। ফা ইন্নাল্ল-হা ক্বিবালা ওয়াজ হিহি -কেন না আল্লাহ তা’য়ালা তার সামনের দিকে রয়েছেন অর্থাৎ এটি হচ্ছে নামাজীকে কিবলার দিকে থুথু নিক্ষেপ করতে নিষেধ করার কারণ। কেননা আল্লাহ তা’য়ালা নামাজীর চেহারার দিকে রয়েছেন। অর্থাৎ সামনের দিকে রয়েছেন, যেভাবে সামনে থাকা আল্লাহ তা’য়ালার বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয়, তিনি সেভাবেই নামাজীর সামনে থাকেন। এতে করে এটি আবশ্যক হয় না যে, তিনি মাখলুকের সাথে একদম মিলিত অবস্থায় রয়েছেন বরং আসমান সমূহের উপর আরশে তিনি সমুন্নত। আরশে সমুন্নত হয়েও তিনি মাখলুকের অতি নিকটে এবং তাদের সকলকে পরিবেষ্টন-কারী। নামাজী যেন তার ডান দিকেও থুথু না ফেলে। কেন না ডান দিকের আলাদা মর্যাদা রয়েছে এবং নামাজীর ডান দিকে রয়েছে দু’জন ফেরেশতা। যেমন ছহীহুল বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, ওয়ালাকিন আই ইয়াছা-রিজি আও তাহতা ক্বদামিহি- একান্ত যদি নামাজী ব্যাক্তিকে থুথু ফেলতেই হয়, তাহলে বাম দিকে অথবা বাম পায়ের নিচে ফেলবে। অর্থাৎ নামাজী ব্যাক্তি যদি থুথু ফেলতে বাধ্য হয়, তাহলে সে যেন তাঁর বাম দিকে কিংবা বাম পায়ের নিচে থুথু নিক্ষেপ করে। এই হাদিছ থেকে প্রমাণিত হলো আসমান সমূহের উপরে আরশে সমুন্নত হয়েও আল্লাহ তা’য়ালা

নামাজী বান্দার নিকটবর্তী হন এবং নামাজীর দিকে বিশেষ ভাবে অগ্রসর হন। (মনোনিবেশ করেন)

হাদিছের উক্ত আলোচনা থেকে এটা বিরোধপূর্ণ হয় না যে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা আরশের উপর সমুন্নত। কেউ যদি প্রশ্ন করে আরশের উপর থেকে নামাজীর সামনে তাঁর দৃষ্টি রাখেন কিভাবে? এর উত্তর হচ্ছে, আল্লাহ ভালো জানেন, তিনি কিভাবে নামাজীর সামনে তাঁর দৃষ্টি রাখে। ঠিক এই প্রশ্ন করাও ভুল যে, আল্লাহ তা'য়ালা আরশের উপরে থাকা সত্ত্বেও শেষ রাতে কীভাবে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন। কেন না আল্লাহর সুমহান গুণাবলীর কোনটির ব্যাপারেই এই প্রশ্ন করা যাবে না যে তার ধারনা কী? আল্লাহর সিফাত সংক্রান্ত আয়াত ও হাদিছ গুলো সাহাবীগণ শুনেছেন। তাদের কেউ এ বিষয়ে প্রশ্ন উপস্থাপন করেনি, সুতরাং তিনি কিভাবে নামাজীর নিকটবর্তী হন বা সিজদার স্থানে দৃষ্টি রাখেন এই প্রশ্ন করা বিদআত। ''ইমাম মালেক (রহি:) কে এক লোক প্রশ্ন করল, আল্লাহ তা'য়ালা আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন। তা কিভাবে? জবাবে ইমাম মালেক (রহি:) বলেছেন, আরশের উপর আল্লাহ সমুন্নত হওয়া একটি জানা বিষয়। এর ধরণ আমার কাছে অজ্ঞাত। এর উপর ঈমান আনায়ন করা ওয়াজিব, এ বিষয়ে প্রশ্ন করা বিদ'আত। অতঃপর সেই প্রশ্নকারীকে বিদ'আতী আখ্যা দিয়ে ইমাম মালেক (রহি:) এর মাজলিস থেকে বের করে দেয়া হলো।'' আরশের উপরে আল্লাহর সমুন্নত হওয়ার ক্ষেত্রেই নয় বরং সকল সিফাতের (বিশেষণের) ক্ষেত্রেই একই কথা। আল্লাহর সিফাতের ধরণ আল্লাহই জানেন। আমরা জানি না। যেমন আল্লাহর সত্তা কেমন, তা আমরা জানি না, সুতরাং আল্লাহর সিফাত সম্পর্কে কথা বলা আল্লাহর জাত (সত্তা) সম্পর্কে কথা বলার মতই। বান্দার জন্য একই সময় একাধিক স্থানে থাকা অসম্ভব, আল্লাহর জন্য আরশের উপর থেকেও দুনিয়ার আসামানে অবতরণ করা নামাজীর নিকটবর্তী হওয়া বা নামাজীর সিজদার স্থানে দৃষ্টি রাখা মোটেই অসম্ভব নয় এবং বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে বুঝার বহির্ভূতও নয়। পূর্বাকাশে সকল বেলা যখন সূর্য উদিত হয়, তখন যদি আমরা পূর্ব দিকে ফিরে দাড়াই এবং বিকাল বেলা যখন পশ্চিমকাশে সূর্য অস্ত যায়, তখন আমরা যদি পশ্চিম দিকে ফিরি তখন সূর্য আমাদের সামনে থাকে। অথচ তা আকাশে থাকে এবং আমাদের বহু উপরে। সূর্য আমাদের সামনে প্রকাশিত হবার জন্য আকাশ

থেকে নেমে আসে না। আল্লাহর সৃষ্টি যদি একই সাথে উপরে এবং আমাদের সামনে থাকতে পারে, তাহলে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তা'য়ালার জন্য আরশের উপর এবং নামাজীর সামনে থাকা কি করে অসম্ভব হতে পারে। (উপরোক্ত আলোচনাটি শারহুল আক্বিদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া -শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমীয়া (রহ:) থেকে উল্লেখ করা হয়েছে)

আক্বিদাহ সম্পর্কের উক্ত আলোচনাটি কুরআন ও ছহীহ হাদিছ দ্বারা যেটা প্রমানিত সেটাই গ্রহণ করা আমাদের জন্য অপরিহার্য। তবে এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে- আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, কোন কিছুই তাঁর অর্থাৎ আল্লাহর সদৃশ নয়। (সূরা শুরা, আয়াতঃ ১১) আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, তাঁর অর্থাৎ আল্লাহর সমতুল্য কেউ নেই। (সূরা ইখলাছ, আয়াতঃ ৪)

অতঃপর, আল্লাহ তা'য়ালাকে নিয়ে সংশিষ্ট আক্বিদাহ গ্রহণে কোন কিছু বাড়াবাড়ি এবং কোন কিছু ছাড়াছাড়ি অবশ্যই বর্জনীয়। এক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তা'য়ালা এবং তাঁর রসূল ﷺ যা বলেছেন, কোন সংশয় ছাড়া সেটা মেনে নেয়াই আনুগত্য। আর আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর, আর তোমাদের কর্ম (আমল) বিনষ্ট করিও না। (সূরা মুহাম্মাদ, আয়াতঃ ৩৩)

অর্থাৎ বিনা দ্বিধায় আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে যাওয়ায় মু'মিনের দায়িত্ব। যদি কেহ এই দায়িত্বে বিন্দুমাত্রও অনিহা দেখায়, তবে তাঁর আমাল তার অজান্তেই নষ্ট হয়ে যাবে। তাতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সিদ্ধান্তে মু'মিনের করনীয় বাস্তব উদাহরণ আমি একটি উল্লেখ করছি-

হযরত উমার ইবনু খত্তাব (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি হাজরে আসওয়াদের কাছে এসে তা চুম্বন করে বললেন, আমি অবশ্যই জানি যে তুমি একখানো পাথর মাত্র, তুমি কারো কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে পারো না। নাবী ﷺ কে তোমায় চুম্বন করতে না দেখলে কখনো আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না। (ছহীহুল বুখারী হা: ১৫৯৭; মুসলিম হা: ১২৭০)

খ. সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ

আল্লাজি বিয়াদিহিল মুল্‌ক- অর্থ যার হাতে সার্বভৌমের রাজত্ব অর্থাৎ সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ। অতঃপর উক্ত আয়াতের মধ্যাংশের দুইটি শাখার (ক) শাখাটি আলোচনার পর, (খ) শাখাটির বিষয় নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন অনুভব করি। (খ) শাখাটিও (ক) শাখার অনুরূপ আক্বিদাহ বিষয় সংশ্লিষ্ট রয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে- ‘‘সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ’’ উক্ত কথাটির পরিবর্তে যদি কেহ বলে, সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক জনগণ অথবা সরকার কিংবা বিশ্ব পরিচালনা সংস্থা- জাতিসংঘ এবং তদানুযায়ী কাজ করে, তবে অবশ্যই তা কুফুরি ও শিরক হবে। কারণ উক্ত কথাটি বিশ্বের প্রতিপালক ও বিশ্ব স্রষ্টা মহান আল্লাহ তা’য়ালার কথার পরিপন্থী। একমাত্র মহান আল্লাহ তা’য়ালা ছাড়া ‘‘সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক দাবিদার যত আছে সবগুলোই তাগুত’’ আর তাগুত পরিচালিত হয় শয়তান দ্বারা। আর যে বা যারা তাগুতকে তাগুত মেনেও তা প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা করে যায় তারা কুরআন মাজিদ এর ভাষ্যমতে কাফির হয়ে যায়। যে ব্যাপারে আল্লাহ তা’য়ালা বলেন, যারা মু’মিন তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে এবং যারা কাফির তারা তাগুতের পথে যুদ্ধ করে। (সূরা নিসা, আয়াতঃ ৭৬)

এমন কি যদি কেহ বলে, সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক ‘‘আল্লাহ’’ আর কর্ম দ্বারা বর্তমান বিশ্ব পরিচালিত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করে, তবে সেও মহান আল্লাহ তা’য়ালার কথার পরিপন্থী। অর্থাৎ তাগুত প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকারী। কারণ ‘‘ঈমান’’ বিষয়টি শুধু মুখের কথায় পরিপূর্ণ হয় না। ঈমান পরিপূর্ণ করতে চাইলে ৩টি বিষয় সম্মিলিত হতে হবে। ১। মুখে উচ্চারণ, ২। অন্তরে বিশ্বাস এবং ৩। কর্মে পরিনত করতে হবে। অন্তরের বিশ্বাস ও কর্মে পরিণত ছাড়া শুধু মুখের উচ্চারণে বিশ্বাস অগ্রহণযোগ্য।

যে ব্যাপারে কুরআন মাজিদ এ মহান আল্লাহ তা’য়ালা বলেন, উহারা অর্থাৎ ইউসুফ (আঃ) ছাড়া ইয়াকুব (আঃ) এর অন্যান্য পূত্রগণ, রাত্রির প্রথম প্রহরে কাঁদিতে কাঁদিতে উহাদের পিতার নিকট আসিল। উহারা বলিল, হে আমাদের পিতা; আমরা দৌড়ের প্রতিযোগিতা করিতেছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদের

মালপত্রের নিকট রাখিয়া গিয়াছিলাম, অতঃপর নেকড়ে বাঘ তাহাকে খাইয়া ফেলিয়াছে; কিন্তু তুমি তো আমাদেরকে বিশ্বাস করিবে না, যদিও আমরা সত্যবাদী। উহারা তাহার জামায় মিথ্যা রক্ত লেপন করিয়া আনিয়াছিল। সে বলিল, না তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনী সাজাইয়া দিয়াছে। সুতরাং, পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যাহা বলিতেছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যস্থল। (সূরা ইউসুফ, আয়াতঃ ১৬-১৮)

উক্ত আয়াত দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝা যায় কাজে পরিনত না করেই কেউ মুখে আল্লাহর প্রতি ঈমান ও আল্লাহ সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক উচ্চারণ করলেও ঈমানের পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। কজেই মু'মিনগণের দায়িত্ব মুখের সেই কথা বিশ্বাস না করলেও তার প্রতি বাড়াবাড়ি না করে, ধৈর্য্য ধারণ করে, আল্লাহর প্রতি ভরসা করা। কারণ যদি আমরা আল্লাহর নাবী ﷺ এর সময়কালীন অনেক যুদ্ধের হাদিছ থেকে দেখি, যুদ্ধের ময়দানে অনেক অমুসলিম প্রাণ হারানোর ভয়ে মুখে উচ্চারণ করে আল্লাহর তাওহিদ ঘোষনা দিয়েছে। যাদেরকে মুসলমান বলেই গন্য করা হয়েছে। যদিও তার কিছুপরেই সেই স্বীকারোক্তির সত্য-মিথ্যা, মহান আল্লাহ তা'য়ালা প্রকাশিত করে দিয়েছেন। এবং পরবর্তীর অবস্থার প্রেক্ষিতেই তার ফায়সালা করা হয়েছে।

ইবনু উমার (রা:) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য নির্দেশিত হয়েছি যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই ও মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রসূল, আর ছলাত প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত আদায় করে। তারা যদি এগুলো করে তবে আমার পক্ষ হতে তাদের জান ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করলো; অবশ্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোন কারণ থাকে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা। আর তাদের হিসাবের ভার আল্লাহর উপর অর্পিত। (ছহীহুল বুখারী হাঃ ২৫; মুসলিম হাঃ ২২)

আর যতক্ষণ ঈমানের বিষয়গুলি অন্তরে বিশ্বাসের সাথে মুখে উচ্চারণ না করবে, ততক্ষণ তার ঈমানের পূর্ণতা লাভ হবে না। তবে যদি কেহ প্রাণ হারানোর ভয়ে যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহ তাওহিদ ও রসূলের রিসালাত ঘোষনা দেয়, এবং পরে সে তা সত্য উপলব্ধি করতে পেরে অন্তর থেকে বিশ্বাস করে, তবে সে মু'মিন

হবে। আর যদি সে ভয়ের কারণে মুখে আল্লাহর তাওহিদ ঘোষনা করে, পরে অন্তর থেকে বিশ্বাস না করে, শুধু নামে মাত্র তাওহিদের ঘোষনাকারী হয়ে থাকে। তবে তাকে ইসলাম মুনাফিক হিসেবে গণ্য করে। কাজেই ঈমানের বিষয়গুলি মুখে ঘোষনার সাথে সাথে অন্তরেও পূর্ণ বিশ্বাস করতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, মানুষের মাঝে কিছু লোক এমনও আছে, যারা মুখে বলে, আমরা আল্লাহ তা'য়ালা ও পরকালের উপর ঈমান এনেছি, কিন্তু এদের কর্মকাণ্ড দেখলে তুমি বুঝতে পারবে এরা ঈমানদার নয়। মুখে ঈমানের দাবী করে তারা আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর নেক বান্দাদের সাথে প্রতারণা করে যাচ্ছে, মূলত এ কাজের মাধ্যমে তারা অন্য কাউকে নয়, নিজেদেরকেই ধোকা দিয়ে যাচ্ছে, যদিও এ ব্যাপারে তাদের কোন প্রকারের চৈতন্য নেই। আসলে তাদের অন্তরের মধ্যে রয়েছে ব্যাধি, অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা তাদের সে ব্যাধি বাড়িয়ে দিয়েছেন, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি, কেননা তারা মিথ্যা বলেছিল। (সূরা বাকারাহ, আয়াতঃ ৮-১০)

ঈমানের বিষয়গুলি যেমন মুখে ঘোষনার সাথে সাথে অন্তরে বিশ্বাস করা জরুরী, অনুরূপভাবে তা কর্মের মাধ্যমে ও বাস্তবায়ন করা অতীব জরুরী, আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, তাদের অধিকাংশ ঈমান এনেছে, তবুও তারা শিরক করে। (সূরা ইউসুফ, আয়াতঃ ১০৬)

উক্ত আয়াতগুলো থেকে জানা যায়, ঈমানে পূর্ণতা লাভের জন্য উপরোক্ত শর্ত ৩ টির যে কোন একটি দিয়ে সম্ভব না। ৩ টি শর্তই অপরিহার্য। অতএব, যদি কেহ মুখে অথবা কাগজ কলমে বলে, ‘‘সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ’’ আর তাদের কাজ কর্ম হয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অথবা গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠার, তবে দুইটিই হবে অভিশপ্ত শয়তানের আনুগত্যের শামিল। অর্থাৎ শয়তান বর্তমানের এই গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা। যেমন আল্লাহ তা'য়ালার মনোনিত দ্বীন ইসলাম। অনুরূপভাবে শয়তানের মনোনীত দ্বীন বর্তমান গণতন্ত্র। আল্লাহ তা'য়ালার মনোনীত দ্বীন, ইসলামের অনুসারীদের অর্থাৎ মুসলিমদের পরিচালনা করা হয় এবং হয়েছে মুসলিমদের প্রাণকেন্দ্র ব্লাক-হাউস তথা কা'বা গৃহের মালিকের পক্ষ থেকে। আর শয়তানের মনোনীত দ্বীন, গণতন্ত্রের অনুসারীদের পরিচালনা করা

হয় এবং হচ্ছে হোয়াইট হাউস তথা সাদা গৃহের মালিকের পক্ষ থেকে। যা সম্পূর্ণটাই ইসলাম পরিপন্থী।

আর বর্তমান গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত রাখার প্রচেষ্টাকারীরা তার অর্থাৎ শয়তানের অনুসারী। আল্লাহ তা'য়ালা শয়তানকে বলেন, বের হয়ে যাও তুমি এখান থেকে অপমানিত ও বিতারিত অবস্থায়; যারাই তোমার অনুসরণ করবে তাদের এবং তোমাদের সবাইকে দিয়ে নিশ্চয়ই আমি জাহান্নাম পূর্ণ করে দেবো। (সূরা আ'রাফ, আয়াতঃ ১৮)

তবে এখন একটি প্রশ্ন আসতে পারে, আর তা হলঃ

১। সরাসরি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা একটি কাজ বা কর্ম। আর,
২। গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম তথা আল্লাহর মনোনীত দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজ বা কর্ম একরকম।

কারণ এখানে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু দুটারই কর্ম ফল একই কেন হবে? উক্ত প্রশ্নে উত্তরটি খুবই সংক্ষেপে দেওয়া যাবে, কিন্তু তবুও আমি একটু বিস্তারিতভাবে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। এ কারণে যে, যেন সাধারণ মুসলমানগণ খুব সহজেই তা উপলব্ধি করতে পারে।

এখানে দুইটি বিষয় উল্লেখিত হয়েছে, ১। **গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা**। ও ২। **গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করা**। কাজেই আমি প্রথমেই ১নং বিষয়টি আলোচনার চেষ্টা করছি।

১ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিষয় বুঝতে হলে, প্রথমেই বুঝতে হবে 'গণতন্ত্র' কাকে বলে। এক কথায় বলতে গেলে, গণতন্ত্র হলো প্রজা তথা জনগণ শাষিত সমাজ বা রাষ্ট্র। যেই সমাজ বা রাষ্ট্রের সাধারণ বা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত অধিকাংশ জনগণের সমর্থনে গ্রহণ হয়ে থাকে, তাকে গণতন্ত্র বলে। যেমন বাংলাদেশের সরকার, এমপি, মন্ত্রী এমন কি ইউপি চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্যসহ যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের সিদ্ধান্তও

নেওয়া হয় জনগণের সমর্থন তথা ভোটের মাধ্যমে। যেকোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অধিকাংশ জনগণের সমর্থন তথা ভোট দিবে, সেই সিদ্ধান্তটাই গ্রহণ হবে। যে কারণে গণতন্ত্রের একটি মন্ত্র বা লঘু হলো ‘‘সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক জনগণ’’ যা আল্লাহ তা’য়ালার বাণীর সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ আল্লাহ তা’য়ালা বলেন,

‘‘আল্লাজি বিয়াদিহিল মুলক’’ অর্থ যার হাতে রয়েছে সার্বভৌমের ক্ষমতা। (সূরা মুলক, আয়াতঃ ১) সুতরাং, আল্লাহ তা’য়ালার বাণীর বিপরীত বা বিরোধী কোন কথা মুসলমান গ্রহণ করতে পারে না, তাছাড়া গণতন্ত্রের আরো একটি বক্তব্য ও কর্মপন্থা হলো, যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে অধিকাংশ জনগণের সমর্থনই চূড়ান্ত। যেই বক্তব্যটি মহান আল্লাহ তা’য়ালার বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিরোধী। আল্লাহ তা’য়ালা বলেন, যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামত চল তবে তাহারা তোমাকে আল্লাহর পথ হইতে বিচ্যুত করিবে। (সূরা আন’আম, আয়াতঃ ১১৬)

উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ তা’য়ালা বলেন, দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষের কথামত চলা যাবে না, অধিকাংশ লোকের সমর্থনে সমর্থন করা যাবে না। যদি কেউ এটা করে, তবে তারা তাকে আল্লাহর পথ থেকে ভ্রান্ত পথে নিয়ে যাবে। অর্থাৎ গোনাহের পথে নিয়ে যাবে।

আল্লাহ তা’য়ালা বলেন, সে বলিয়াছিল আপনি কি বিবেচনা করিয়াছেন, আপনি আমার উপর এই ব্যক্তিকে (আদম) কে মর্যাদা দান করিলেন। কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দেন তাহলে আমি অবশ্যই তার বংশধরদের আমার আয়ত্তে নিয়ে আসবো, তবে অল্প সংখ্যক ছাড়া। (সূরা বানী ইসরায়েল, আয়াতঃ ৬২)

উপরোক্ত আয়াত থেকে জানা যায়, অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া অধিকাংশ মানুষকেই শয়তান তার আয়ত্বে নিয়ে আসবে। আর কেবল মাত্র অল্প সংখ্যক মানুষই মহান আল্লাহ তা’য়ালার প্রতি একনিষ্ট হবে। আল্লাহ তা’য়ালা বলেন, অতঃপর তাদের অর্থাৎ মানুষদের অল্প সংখ্যকই ঈমান আনে অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি একনিষ্ট থাকে। (সূরা বাকারাহ, আয়াতঃ ৮৮)

আর অধিকাংশ মানুষকেই শয়তান পথভ্রষ্ট করে তার নিজের ইবাদতে অর্থাৎ গোলামীতে যুক্ত করে দেয়। কুরআন মাজীদে মহান আল্লাহ তা'য়ালা শয়তানের ব্যাপারে বলেন, সে অর্থাৎ শয়তান বলিল, তুমি আমাকে বিতারিত করিলে, এইজন্য আমিও তোমার সরল পথে মানুষের জন্য নিশ্চয়ই ওঁৎ পাতিয়া থাকিব। অতঃপর আমি তাদের নিকট আসিবই তাহাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, ডান ও বাম দিক হইতে এবং তুমি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাইবে না। (সূরা আ'রফ, আয়াতঃ ১৬-১৭)

উক্ত আয়াতেও জানা যায়, অধিকাংশ মানুষের সংখ্যাটি শয়তানের প্রবঞ্চনার শিকার। আর শয়তান মানুষকে নিজের দিকে নেবার জন্য সকল সুখ-বিলাসিতা দিয়ে মানুষকে নিজের ইবাদতে উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, হে মানুষ! নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য: সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক অর্থাৎ শয়তান যেন কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রবঞ্চিত না করে। (সূরা ফাতির, আয়াতঃ ৫)

উক্ত আয়াতের তাফসীরে ইমাম কুরতুবী (রহি:) বলেন, অতি প্রবঞ্চক বলতে শয়তানকে বোঝানো হয়েছে। তার কাজই মানুষকে প্রতারিত করে কুফর ও গোনাহে লিপ্ত করা। (মা'রিফুল কুরআন, পৃ: ১১১৮)

শয়তান মানুষকে প্রতারিত করে ধোকায় ফেলার প্রধান মাধ্যম এই দুনিয়ার চাকচিক্যতা মানুষের নিকট আনন্দদায়ক করে তুলে ধরা। যখন কোন ব্যাক্তি শয়তানের প্রবঞ্চনায় প্রবঞ্চিত হয়ে, দুনিয়ার মোহে পড়ে যায়। তখনই সে মহান আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ-নিষেধ কে অমান্য করে চলে। আর এই দুনিয়ার মোহের একটি গল্প আমি উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করছি-

একজন ব্যক্তি একটি হিংস্র বাঘের তাড়া খেয়ে দৌড়াতে গিয়ে একটি শুকনো কূপ দেখতে পায়। সে তার জীবন বাচানোর তাগিদে কূপের রশি ধরে কূপের নিচের দিকে ঝুলে রয়। কিন্তু সেই ব্যক্তি কূপের রশি ধরে ঝুলন্ত অবস্থায় নীচের দিকে তাকিয়ে দেখে একটি বিশাল বড় অজগর সাপ, ক্ষুধার্থ অবস্থায় তার দিকে তাকিয়ে বিরাট হা করে রয়েছে। সে তা দেখেই চমকে উঠে। অতঃপর সে উপরে

দিকে তাকিয়ে দেখে হিংস্র বাঘটি কূপের সামনে দাড়িয়ে আছে। আর কূপের ঝুলন্ত রশিটির দুই পাশে দুইটা ইঁদুর- একটি সাদা আর একটি কালো রঙের। ইঁদুর দুইটি সেই রশিটি দাঁত দিয়ে ধীরে ধীরে কাটছে। যদিও দৃশ্যটি দেখে সেই ব্যাক্তির ভয়ে সমস্ত শরীরের লোমের গোড়া দিয়ে ঘাম ঝরা শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই হঠাৎ সে তার বাম পাশে তাকিয়ে দেখতে পায়, একটি মৌমাছির মৌচাক। যাতে মৌমাছি নেই কিন্তু পর্যাপ্ত মধু সেই মৌচাক বেয়ে নিচে পড়ে যাচ্ছে। লোকটি সেই মধুর রং ও তা গড়িয়ে পড়ার দৃশ্য দেখে নিজের প্রবৃত্তির লোভকে আর সামলাতে না পেরে, মৌচাকের দিকে মুখটা এগিয়ে দিয়ে এক ফোটা মধু তার জিহ্বাতে নেয়। ফলে সে আরো লোভনীয় হয়ে পড়ে মধুর প্রতি। মধু খেতে শুরু করে। এক পর্যায়ে সে তার বিপদ মুহুর্তের কথা ভুলে গিয়ে ক্ষণিকের লালসায় মধুর প্রতি উম্মাদ হয়ে যায়। এক সময় যখন তার মধুর তৃপ্তি শেষ হয়ে যায় তখন সে আবার সেই বাস্তব বিপদ মুহূর্তের সম্মুখীন হয়ে যায়। তখন সে বুঝতে পারে মধু পানই ছিলো তার ক্ষণস্থায়ী মুহুর্ত।

গল্পটিতে হিংস্র বাঘটি ছিলো মানুষের মৃত্যু। কূপের রশিটি ছিলো মানুষের হায়াত। সাদা ইঁদুরটি ছিলো দিন আর কালো ইঁদুরটি ছিলো রাত। যা ক্রমান্বয়ে মানুষের হায়াত থেকে রাত-দিন কেটে যাচ্ছিলো। কূপের গভীরে তার কবর। যেই দৃশ্যটি মানুষের জীবনের বাস্তব মুহূর্ত। আর মধু পানের দৃশ্যটিই লোভনীয় ও চাকচিক্য এই দুনিয়া। সেটার লোভ দেখিয়েই শয়তান মানুষকে প্রতারিত করে। আর দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষই হয় শয়তানের প্রতারনার শিকার। এখন কেহ যদি প্রশ্ন করে শয়তান কিভাবে মানুষকে দুনিয়ার লোভ দেখিয়ে প্রতারিত করে? তাকে তো দেখা যায় না? উক্ত প্রশ্নের উত্তর মহান আল্লাহ তা’য়ালা কুরআন মাজিদে উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ তা’য়ালা বান্দাকে শিক্ষা দিয়ে বলেন, বল, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের রবের। মানুষের মালিকের। মানুষের মা’বুদের নিকট। (সূরা নাস, আয়াতঃ ১-৩) এখন কোন বিষয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে, সেটা শিখিয়ে দিয়ে মহান আল্লাহ তা’য়ালা বলেন, আত্মগোপনকারী অর্থাৎ শয়তান, এখানে আরবীতে (اَلْخَنَّاسِ) দ্বারা শয়তানকেই বুঝানো হয়েছে। কারণ “খন্নাস” শয়তানের একটি সিফাতি নাম। যার অর্থ গুপ্ত থাকা এবং আল্লাহর যিকর যেখানে হয় সেখান হইতে সরিয়ে পড়া। (তাফসিরে জালালাইন- উক্ত আয়াতের তাফসীর) অর্থাৎ শয়তানের

মন্দ ওয়াছ ওয়াছা বা কুমন্ত্রণা দাতার অনিষ্ট হইতে। যে কুমন্ত্রনা দেয় মানুষের অন্তরে। (সূরা নাস, আয়াতঃ ৪-৫)

উক্ত আয়াত দুইটিতে শয়তানের কর্মের কথা তুলে ধরা হয়েছে। যে নিজেকে মানুষের কাছে গোপন রেখে, মানুষের মনের মধ্যে কুমন্ত্রণা দেয়। যদিও তার ওয়াছ ওয়াছা জঘন্য। কিন্তু সে এই জঘন্য ওয়াছ ওয়াছাকেই মানুষের নিকট সুন্দর ও শোভনীয় করে তুলে ধরে। ফলে অধিকাংশ মানুষই শয়তানী ওয়াছ ওয়াছায় পড়ে। মানুষের প্রকৃত মা'বুদ ও তাঁর আদেশ-নিষেধ অমান্য করে। আর শুধু যে, সে গুপ্ত থেকে ওয়াছ ওয়াছা দিয়েই ক্ষান্ত থাকে তা নয়। বরং তার দলবল রয়েছে মানুষ ও জ্বিন জাতির মধ্যে। তাদেরকে দিয়েও বিভিন্ন ভাবে অন্য মানুষ ও জ্বিনদেরকে কুমন্ত্রনা দেয়। এজন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালা সূরা নাস এর শেষ নং আয়াতে বলেন, জ্বিনের মধ্য হইতে এবং মানুষের মধ্য হইতে। অর্থাৎ মহান আল্লাহ তা'য়ালা শয়তানের জ্বিন কর্মী ও মানুষ কর্মীদের থেকে ও মহান আল্লাহ তা'য়ালার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে আদেশ করেছেন। তার কারণ শয়তান নিজে গোপন থেকে মানুষের অন্তরে অবিরত কুমন্ত্রণা তো দিয়ে যাচ্ছেই। তার সাথে তার জ্বিন ও মানব কর্মীরাও মানুষদের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেবার কাজ অব্যাহত রেখেছে। সেই কুমন্ত্রণা গুলোর মধ্য হতে অন্যতম একটি হলো সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক জনগণ অর্থাৎ যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে অধিকাংশ জনগণের সমর্থনই চূড়ান্ত। এখন প্রশ্ন হতে পারে উক্ত কথাটি কিভাবে শয়তান ও তার অনুসারীদের কুমন্ত্রণা হতে পারে? উক্ত কথাটি তো জনগণের কল্যানের জন্য? আর কল্যাণকর কাজ কিভাবে শয়তানের কুমন্ত্রণা হয়? উত্তরে বলব, কল্যাণকর কাজ শয়তানের কুমন্ত্রণা না। তবে তার কর্ম ও পদ্ধতি এবং নিয়্যাত নিঃসন্দেহে শয়তানের কুমন্ত্রণা। আর তার কারণ জানতে হলে আমাদের আগে জানতে হবে-

শয়তান কি চায়

১। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার নির্দেশ দেয়। (সূরা বাকারাহ, আয়াতঃ ২৬৮)

২। শয়তান বলিল, তুমি আমাকে বিতারিত করিলে, এই জন্য আমিও তোমার সরল পথে মানুষের (বাধা দেবার) জন্য ওঁৎ পাতিয়া থাকিব। (সূরা আরাফ, আয়াতঃ ১৬)

৩। শয়তান বলিল, আমি তাদের নিকট আসিবই তাদের সামনে, পিছনে, ডান ও বাম দিক হইতে এবং তুমি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাইবে না। (সূরা আরাফ, আয়াতঃ ১৭)

৪। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, তাহাদের লজ্জাস্থান, যাহা তাহাদের নিকট গোপন রাখা হইয়াছিল তাহা তাহাদের কাছে প্রকাশ করিবার জন্য শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রনা দিল এবং বলিল, যাতে তোমরা উভয়ে ফেরেশতা হইয়া যাও কিংবা তোমরা স্থায়ী হও এই জন্যই তোমাদের রব এই বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদেরকে নিষেধ করিয়াছেন। (সূরা আরাফ, আয়াতঃ ২০)

৫। হে মানব জাতি! পৃথিবীতে যাহা কিছু হালাল ও পবিত্র খাদ্য বস্তু রহিয়াছে তাহা হইতে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পথ অনুসরণ করিও না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সূরা বাকারাহ, আয়াতঃ ১৬৮)

৬। যখন আমি ফেরেশতাদের বলিলাম, আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতিত সকলেই সিজদা করিল, সে অমান্য করিল ও অহংকার করিল। সুতরাং সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হইল। (সূরা বাকারাহ, আয়াতঃ ৩৪)

৭। হে মু'মিন গণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার দেবী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃন্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা উহা বর্জন কর যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার। (সূরা মায়িদা, আয়াতঃ ৯০)

৮। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাইতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে ও ছলাতে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হইবে না। (সূরা মায়িদা, আয়াতঃ ৯১)

৯। তাহারা অর্থাৎ শয়তানের অনুসারীরা ইহাই কামনা করে যে, তাহারা যেরূপ কুফরী করিয়াছে তোমরাও সেইরূপ কুফরী কর, যাহাতে তোমরা তাদের সমান হইয়া যাও। (সূরা নিসা, আয়াতঃ ৮৯)

১০। তাঁহার অর্থাৎ আল্লাহর পরিবর্তে তাহার দেবীরই পূজা করে এবং বিদ্রোহী শয়তানেরই পূজা করে। (সূরা নিসা, আয়াতঃ ১১৭)

১১। আল্লাহ তাহাকে অর্থাৎ শয়তানকে লা'নত করেন এবং সে অর্থাৎ শয়তান বলে, আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের এক নির্দিষ্ট অংশকে আমার অনুসারী করিয়া লইব। (সূরা নিসা, আয়াতঃ ১১৮)

১২। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, শয়তান বলেছে, আমি তাহাদেরকে অর্থাৎ আদম সন্তানদেরকে পথভ্রষ্ট করিবই; তাহাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করিবই, আমি তাহাদেরকে নিশ্চয়ই নির্দেশ দিব আর তাহারা পশুর কর্ণচ্ছেদ করিবেই, এবং তাহাদেরকে নিশ্চয়ই নির্দেশ দিব আর তাহারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করিবেই। আল্লাহর পরিবর্তে কেহ শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিলে সে স্পষ্টতই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (সূরা নিসা, আয়াতঃ ১১৯)

এই আয়াতগুলো ছাড়াও কুরআন ও ছহীহ হাদিছে অনেক আলোচনা রয়েছে যাতে সুন্দর ভাবে বর্ণিত হয়েছে শয়তান ও তার কর্মীদের কর্ম ও পদ্ধতির বিষয়গুলো। তার মধ্য হতেই আমি এখানে একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। যেটা কুরাইশদের "দারুন নাদওয়া বৈঠক" নামে চিহ্নিত। যা ইতিহাসে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও ঘৃনিত একটি বৈঠক। যেই বৈঠকে ইবলীস শয়তান নিজেই উপস্থিত ছিলো এক বৃদ্ধের বেশে। তার পরিধানে ছিলো জুব্বা। পার্লামেন্টের প্রবেশদারে তাকে দেখে লোকেরা বলল, আপনি কে? আপনাকে তো চিনতে পারলাম না। শয়তান বলল, আমি নজদের অধিবাসী। আপনাদের কর্মসূচি শুনে উপস্থিত হয়েছি। আপনাদের আলোচনা শুনতে চাই, আশা করি কিছু কার্যকর পরামর্শ দিতে পারব। পৌত্তলিক নেতারা শয়তানকে সসম্মানে নিজেদের মাঝে উপবেশন করাল। "আলোচনার বিষয় আল্লাহর রসূল ﷺ কে হত্যার নীল নকশা" পার্লামেন্টে সবাই উপস্থিত হওয়ার পর আলোচনা শুরু হল। দীর্ঘক্ষণ আলোচনার পর বিভিন্ন প্রস্তাব উপস্থাপিত

হল। প্রথমে আবুল আসওয়াদ প্রস্তাব করল যে, মুহাম্মদ ﷺ কে আমরা আমাদের মধ্য থেকে বের করে দেব। তাকে মক্কায় অবস্থান করতে দেব না। আমরা তাঁর ব্যাপারে কোন সংবাদ ও রাখব না। যে তিনি কোথায় যান, কি করেন। এতেই আমরা নিরাপদে থাকতে পারব এবং আমাদের মধ্যে পূর্বের ন্যায় সহমর্মিতা ফিরে আসবে। শেখ নজদী বেশধারী শয়তান বলল, এটা কোন কাজের কথা হল না। তোমরা কি লক্ষ্য করনি যে, তাঁর কথা কত উত্তম, কত মিষ্টি। তিনি সহজেই মানুষের মন জয় করেন। তোমরা তাঁর ব্যাপারে বেখেয়াল থাকলে তিনি কোন আরব গোত্রে গিয়ে উপস্থিত হবেন এবং তাদেরকে নিজের অনুসারী করার পর তোমাদের উপর আক্রমন করবেন। এরপর তোমাদের শহরেই তোমাদেরকে নাস্তানাবুদ করবেন। সুতরাং তোমরা অন্য কোন প্রস্তাব চিন্তা কর। আবুল বুখতারী বলল, তাঁকে লোহার শেকলে বেঁধে ঘরের ভেতর রেখে বাহির থেকে ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখা হোক মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত। যোহাইর এবং নাবেগার এভাবেই মৃত্যু হয়েছিল। শেখ নজদী বেশধারী শয়তান বলল, এ প্রস্তাবও গ্রহণযোগ্য নয়। তোমরা তাকে আটক করে গৃহাভ্যান্তরে রাখলে যেভাবেই হোক, তাঁর সংবাদ তাঁর সাথীদের নিকট পৌঁছে যাবে। এরপর তারা মিলিতভাবে তোমাদের উপর হামলা করে তাঁকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে। এরপর তাঁর সাহায্যকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে তোমাদের উপর আক্রমন করবে। সেই আক্রমনে তোমাদের পরাজয় অনিবার্য। সুতরাং অন্য কোন প্রস্তাব নিয়ে চিন্তা কর। উল্লেখিত দু'টি প্রস্তাব বাতিল হওয়ার পর তৃতীয় একটি প্রস্তাব পেশ করা হয়। মক্কার জঘণ্য এক অপরাধী আবু জাহেল এ প্রস্তাব উপস্থাপন করল। সে বলল, তাঁর সম্পর্কে আমার একটি প্রস্তাব রয়েছে। আমি লক্ষ্য করে দেখলাম, এখনো আমরা সেই প্রস্তাবের নিকটেও পৌঁছিনি। সবাই বলল, আবুল হাকাম, কি সেই প্রস্তাব? আবু জাহেল বলল, প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন যুবককে বাছাই করে তাদের হাতে একটি করে ধারালো তরবারী প্রদান করা হবে। এরপর সশস্ত্র শক্তিশালী যুবকরা একযোগে তাকে হত্যা করবে। এমন ভাবে মিলিত আক্রমণ করতে হবে, দেখে যেন মনে হয় একজন আঘাত করেছে। এতে করে আমরা এ লোকটির হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাবো। এভাবে যদি হত্যা করা হয়, তবে তাঁকে হত্যার দায়িত্ব সব গোত্রের মধ্যে ছড়িয়ে যাবে। বানু আবদে মান্নাফ সব গোত্রের সাথে তো আর যুদ্ধ করতে পারবে না। ফলে তারা

হত্যার ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করতে সম্মত হবে। আমরা তখন তাকে হত্যার ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেব। (ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৮০-৪৮২)

শেখ নজদী বেশধারী শয়তান প্রস্তাব সমর্থন করল। মক্কার পারর্লামেন্টে এ প্রস্তাবের উপর ঐক্যমতে উপনীত হলো। সকলেই এই সংকল্পের সাথে গৃহে ফিরে গেল যে, অবিলম্বে এ প্রস্তাব কার্যকর করতে হবে। (আর রহিকুল মাখতুম -শফিউর রহমান মোবারকপুরী. পৃ: ১৬২-১৬৩)

সিরাতের উক্ত আলোচনা থেকে আরো একটি বিষয় জানা গেলো যে, শয়তানের চাওয়ার মধ্যে আরো ১টি হলো, শয়তান আল্লাহর নাবী-রসূল ও নেককার বান্দাদের হত্যা করতে চায়। উক্ত আলোচনার পর আবারও একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, শয়তান কি চায় তার সাথে "সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক জনগণ" উক্ত কথাটির সম্পর্ক কী? উত্তরে বলব, শয়তানের চাওয়া পাওয়ার সাথে উক্ত উক্তিটিই সম্পূর্ণভাবে জড়িত। যখন শয়তান উক্ত কথাটি কাজে বাস্তবায়িত করতে পারবে, তখন তার সকল চাওয়া-পাওয়া এমনিতেই বাস্তবায়িত হয়ে যাবে। আর হয়েছেও তাই। কারণ আদম (আঃ) কে সৃষ্টির পর থেকে বহুবার তার কর্মী বাহিনী দিয়ে এমন কি সে নিজেও আল্লাহর নাবী-রসূল ও নেককার বান্দাদের পরাজিত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে তবুও তাঁদেরকে পরাজিত করতে পারেনি। এমনকি শয়তান তার কর্মী বাহিনীদেরকে নিয়ে আল্লাহর নাবী রসূল ও নেককার বান্দাদের সাথে সশস্ত্র যুদ্ধ ও করেছে। সেখানে মুসলিম সৈন্যের চেয়ে শয়তানের সৈন্য ছিলো বহুগুন বেশি। তবুও সে পরাজিত হয়েছে, যদি ইতিহাস স্মরণ করেন তবে দেখতে পাবেন বদরের যুদ্ধে তাওহিদের পক্ষে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা ছিলো মাত্র ৩১৩-৩১৫ জন আর শয়তানের পক্ষে কাফিরদের সংখ্যা ছিলো ১ হাজার জন। উহুদের যুদ্ধে তাওহিদের পক্ষে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা ছিলো মাত্র ৭ শত জন, আর শয়তাদের পক্ষে কাফির সৈন্য সংখ্যা ছিলো ৩ হাজার। খন্দকের যুদ্ধে তাওহিদের পক্ষে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা ছিলো ৩ হাজারের মত। আর শয়তানের পক্ষে কাফিরদের সৈন্য সংখ্যাছিলো ১০ হাজারেরও বেশি। অনুরূপভাবে মুতার যুদ্ধে তাওহিদের পক্ষে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা ছিলো মাত্র ৩ হাজার। আর শয়তানের

পক্ষে কাফিরদের সৈন্য সংখ্যা ছিলো ২ লক্ষ। (যুদ্ধগুলোর সৈন্য সংখ্যা তালিকা সংগ্রহ করা হয়েছে- আর রহিকুল মাখতুম -শফিউর রহমান মোবারকপুরি হতে)

অস্ত্রযুদ্ধে যখন শয়তান

অস্ত্রযুদ্ধে যখন শয়তান তার অধিক পরিমানের সৈন্য সংখ্যা নিয়েও আল্লাহর সৈনিকদের সঙ্গে পরাজিত হয়েছে। তখন সে বিভিন্ন পথ ও পন্থা অবলম্বন করেছে। শয়তান বুঝতে পেরেছে যুগে যুগেই তার সৈন্য সংখ্যা থাকবে বেশি। আর তাওহিদের প্রতি একনিষ্টদের সৈন্য সংখ্যা যুগে যুগেই থাকবে কম। কিন্তু তাঁদের ঈমানী শক্তি আর শাহাদাতের তামান্না এতো বেশি থাকবে যে, তাদের সাথে সশস্ত্র যুদ্ধ করে বিজয় লাভ করা একেবারেই অসম্ভব। কাজেই শয়তান ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করে অধিকাংশ মানুষের সমর্থনই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত উক্তিটা প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা করেছে এবং সফলও হয়েছে। আর এই চেষ্টা করে সফলতা হবার একটিই কারণ তা হলো, শয়তান জানতো মানুষকে দুনিয়ার মোহে ফেলিয়ে আখিরাতকে ভুলিয়ে রাখতে পারলেই দুনিয়াতে সে তার কুকর্মগুলো প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। অধিকাংশ মানুষই চাইবে দুনিয়ার চাকচিক্যতা। আর অল্প কিছু লোক অতিকষ্ট হলেও তারা ঈমানের পরীক্ষায় অটুট থেকে আল্লাহর সাহায্য চাইবে। সুতরাং উক্ত উক্তিটা অর্থাৎ ‘‘গণতন্ত্র’’ নামের ধর্মটা যদি প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তবে দুনিয়ার নিয়ম-নীতি চলবে অধিকাংশ মানুষের কথায়। আর অধিকাংশ মানুষ চলবে শয়তানের কথায়। যখন অধিকাংশ মানুষ কোন মন্দ কর্মের সিদ্ধান্ত নিবে তখন অল্প সংখ্যক মানুষের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করার কোন উপায় থাকবে না। কাজেই শয়তান সর্বপ্রথম যেই কাজটি প্রতিষ্ঠিত করেছে, তা হলো গণতন্ত্র। অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষের সমর্থনেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। এটা প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে শয়তান মানুষকে বিশেষ করে মুসলিমদেরকে মহান আল্লাহ তা’য়ালার একটি বড় হুকুম অমান্য করতে সক্ষম হয়েছে। মহান আল্লাহ তা’য়ালা বলেন, ‘‘ওয়াল ইয়া’খুজু-হিজরোহুম ওয়া আসলিহাতাহুম ওয়াদ্দাল্লাজি-না কাফারূ লাও তাগফুলু-না ‘আন আসলিহাতিকুম ওয়া আমতি’আতিকুম ফা ইয়ামীলু-না ‘আলাইকুম মাইলাতাও ওয়াহিদা’’। অর্থ: তাহারা যেন সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে। কাফিররা কামনা করে যেন

তোমরা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসর্তক হও যাহাতে তাহারা তোমাদের উপর একেবারে ঝাপাইয়া পড়িতে পারে। (সূরা নিসা, আয়াতঃ ১০২)

উপরোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা মুসলিমদের সর্বদা সশস্ত্র থাকতে আদেশ দিয়েছেন। আর এটাও বলে দিয়েছেন, কেন মুসলিমদেরকে সর্বদা সশস্ত্র থাকতে হবে। কারণ শয়তান ও তার অনুসারীরা মনে মনে এটাই আশা করে যে, মুসলমান যেন তাঁদের নিকট থেকে অস্ত্র সরিয়ে ফেলে। আর অস্ত্র মুসলমানদের নিকট থেকে সরিয়ে ফেলতে পারলেই শয়তান তার দলবল নিয়ে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং মুসলমানের সকল ঘাটি দিনে দিনে দখল করতে পারবে। অতএব, অভিশপ্ত শয়তান করেছেও তাই। সে গভীর ষড়যন্ত্র করে মুসলমানদের নিকট থেকে অস্ত্র সরিয়ে ফেলেছে। অস্ত্রের বদলে মুসলমানদের হাতে তুলে দিয়েছে ভোট নামের এক গণতন্ত্রের চাবি। যা দিয়েই শয়তান প্রতিষ্ঠিত রেখেছে গণতন্ত্র নামের এক ধর্ম। আর তৈরি করছে আল্লাহ তা'য়ালার রীতি-নীতির বিপক্ষে বিভিন্ন কুফুরি রীতি-নীতি। যেই রীতি-নীতি মান্য করার মাধ্যমে মানুষ শয়তানকে রব মেনে শয়তানের ইবাদত করছে। অথচ মহান আল্লাহ তা'য়ালা শয়তানের ইবাদত করতে নিষেধ করে ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পিতাকে বলা কথাটি কুরআন মাজিদে উল্লেখ করেন। ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পিতাকে বলিল, "হে আমার পিতা! শয়তানের ইবাদত করিও না। শয়তান তো দয়াময়ের অবাধ্য।" (সূরা মারইয়াম, আয়াতঃ ৪৪)

অন্যথায় আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আল্লাহর সাথে অপর কোন ইলাহ সাব্যস্ত করিওনা, করিলে নিন্দিত ও লাঞ্ছিত হইয়া পড়িবে। (সূরা বানী ইসরাইল, আয়াতঃ ২২)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, তোমরা দুই ইলাহ গ্রহণ করিও না; তিনিই তো একমাত্র ইলাহ, সুতরাং আমাকেই ভয় কর। (সূরা নাহল, আয়াতঃ ৫১)

উপরোক্ত আলোচনা ও আয়াতগুলো থেকে জানা যায়, একমাত্র মহান আল্লাহ তা'য়ালা কেই ইলাহ মেনে একমাত্র তারই ইবাদত করতে হবে। যারা পরাক্রমশালী আল্লাহকে বাদ দিয়ে অভিশপ্ত শয়তানের ইবাদত বা অনুসরণ করবে,

মহান আল্লাহ তা'য়ালা অবশ্যই অভিশপ্ত শয়তান ও তার ইবাদতকারীদেরকে দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করবেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, এই স্থান হতে লাঞ্ছিত ও বিতারিত অবস্থায় বাহির হইয়া যাও। মানুষের মধ্যে যাহারা অনুসরণ করিবে নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করিবই। (সূরা আরাফ, আয়াতঃ ১৮)

এখানে প্রশ্ন হতে পারে গণতন্ত্র মানা বা প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে আবার শয়তানের ইবাদতের কী আছে? তাছাড়া আমরা নামাজ পড়ি, রোযা করি, হাজ্জ করি এবং যাকাতও দেই। এটা তো আল্লাহ তা'য়ালারই ইবাদাত? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, এই ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই আগে দ্বীন বুঝতে হবে।

দ্বীন অর্থ

দ্বীন হলো রীতি-নীতি অর্থাৎ বিধি-বিধান। দ্বীনুল ইসলাম হলো- নাবী ও রসূলগণের অনুসরনের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তা'য়ালার কাছে আত্মসমর্পণ করে আল্লাহর সকল বিধি-বিধান মেনে নেওয়া এবং তদোনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। আর এই দ্বীনুল ইসলাম সম্পর্কেই মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন। (সূরা আল ইমরান, আয়াতঃ ১৯)

অতএব, দ্বীনুল ইসলামের বিপরীত যে কোন বিধি-বিধানই একটি দ্বীন। আর তা অবশ্যই বর্জনীয়। অনুরূপভাবে গণতন্ত্রেরও একটি বিধি-বিধান রয়েছে। কাজেই গণতন্ত্র একটি দ্বীন। এসম্পর্কে শাইখ রহমানী (দা: বা:) বলেন, ইসলাম যেমন একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা), গণতন্ত্রও তেমনিভাবে স্বতন্ত্র একটি দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা)। ইসলামের ভিত্তি আল্লাহর সার্বভৌমত্বের উপর। আর গণতন্ত্রের ভিত্তি মানুষের সার্বভৌমত্বের উপর। (আত-ত্বরীক ইলা ইক্বমাতিদ দ্বীন, পৃ: ৪৮৬)

আর আমি পূর্বেই আলোচনা করেছি গণতন্ত্রের উদ্ভাবক ও কুমন্ত্রণাদাতা হলো অভিশপ্ত শয়তান। আর কেন গণতন্ত্র দ্বীন তৈরি করা হয়েছে সেটাও আমি পূর্বেই বলেছি। তার একমাত্র লক্ষ্য উদ্দেশ্য হলো আদম সন্তানকে মন্দ কর্ম প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে আদম সন্তানকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া। কাজেই আমি ইসলামের

সাথে গণতন্ত্রের সাংঘর্ষিক বিষয়গুলো নিয়ে উল্লেখ করছি। তবে তার পূর্বেই গণতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের আরো পরিষ্কার হওয়া জরুরী। যেমন ইসলাম বলে, সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ। অনুরূপভাবে গণতন্ত্রও বলে, সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক জনগণ। যেমন ইসলামে আইন-বিধান প্রনয়ন করা ক্ষমতা কেবল মাত্র আল্লাহর। অনুরূপভাবে গণতন্ত্রেরও আইন-বিধান তৈরী করার ক্ষমতা কেবল মাত্র জনগণের। আর গণতন্ত্রের অর্থও তাই।

গণতন্ত্র সম্পর্কে কিছু উক্তিঃ

আইনের অধ্যাপক ড. আব্দুল হামিদ মিতওয়ালী বলেন, শাসন ব্যবস্থা ‘‘গণতন্ত্র’’ জাতির প্রভূত্বের অর্থাৎ রবের নীতিতে পরিণত হয়েছে। অধিকন্ত সংজ্ঞানুযায়ী প্রভূত্ব হচ্ছে সেই সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব যার উপর অন্য কোন কর্তৃত্ব নেই। (Dr. Hamid Mitwali’s Ruling System in Developing Country, ড. হামিদ মিতওয়ালীস রুলিং সিস্টেম ইন ডেভেলপিং কান্ট্রী, সংস্করণ ১৯৮৫, পৃ: ৬২৫)

পশ্চাত্য রাজনীতিবিদ জোসেফ ফ্রাঙ্কেল বলেন, প্রভূত্বের অর্থ হচ্ছে সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব যা এর উপরে অন্য কোন কর্তৃত্ব স্বীকার করে না এবং যার পশ্চাতে সিদ্ধান্ত সমূহ পূর্ণবিবেচনা করার মত কোন বৈধ কতৃত্বেও অধিকারী নেই। (জোসেফ ফ্রাঙ্কেল এর The International Relationship, দ্যা ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনশিপ, তুহামা পাবলিশিং, ১৯৮৪, পৃ: ২৫)

বিষয়টিকে আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন আরো স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি গেটিসবার্গে এক বক্তৃতায় গণতান্ত্রিক সরকারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, গণতন্ত্র হল জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা, জনগণের সরকার। এছাড়াও বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭ এর ধারা দুইতে বলা হয়েছে, ‘‘জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে’’। (বাংলাদেশের সংবিধান ও সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষনা -চতুর্দশ সংশোধনী পরবর্তী প্রকাশিত, এম.এ.সালাম রচিত, কালার সিটি কর্তৃক মূদ্রিত, পৃ: নং ৯)

উক্ত উক্তিগুলো হতে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় গণতন্ত্র কী ও গণতন্ত্র কি চায়। অথচ মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, জেনে রাখ সৃষ্টি ও নির্দেশ কেবল মাত্র তাঁরই অর্থাৎ আল্লাহর। (সূরা আ'রাফ, আয়াতঃ ৫৪)

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন, বিধান একমাত্র আল্লাহরই। তিনিই নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কারো ইবাদাত কর না। (সূরা ইউসুফ, আয়াতঃ ৪০)

শাইখ রহমানী (দা: বা:) বলেন, ইসলামে আইন বিধান দেওয়ার ইখতিয়ার কেবল মাত্র সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তা'য়ালার জন্য সংরক্ষিত, তাই অন্য কেউ আইন তৈরী করলে সে যেন নিজেকে আল্লাহর অংশীদার বলে দাবী করলো। এ কারণেই আল্লাহ (সুব:) পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন, তাদের জন্য কি এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদের জন্য দ্বীনের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? আর ফায়সালার ঘোষনা না থাকলে তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েই যেত। আর নিশ্চয়ই জালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। (সূরা শুরা, আয়াতঃ ২১) (আত তুরিক ইলা ইক্বমাতিদ দ্বীন, পৃ: ৪৮৮)

ইমাম গাজ্জালী (রহি:) বলেন, আমাদের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তিনি এক, অদ্বিতীয়, আর আইন-বিধান দেবারও মালিক কেবল তিনিই। অন্য কেউ আইন বিধান তৈরি করলে, সে নিজেকে আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্ত করলো। (ইহইয়াউল উলুম, পৃ: ২৩৮)

শাইখ আব্দুল কাদির জিলানী (রহি:) বলেন, কোন প্রকার দ্বিধা ও সন্দেহ ব্যতীত ইসলামী বিধি-বিধান সত্য ও যথার্থ বিধি-বিধান হিসাবে মানুষের সর্বোত্তম জীবন ব্যবস্থা বলিয়া মনে করিতে হবে। (ফাতুহুল গয়ব, পৃ: ১০) তিনি আরো বলেন, ইসলামের বিধি-বিধান ক্ষুন্ন করা ইসলামী ধর্মদ্রোহিতা অর্থাৎ ইসলামী বিধি-বিধান লংঘনকারী। (ফাতহুল গয়ব, পৃ: ৩১২)

শাইখ আব্দুল কাদির জিলানী (রহি:) আরো বলেন, বিধি-বিধান তৈরি করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার। যদি কেহ তা ব্যাতিত অন্য কোন বিধি-বিধান রচনা করে, তবে সে নিজেকে ইলাহ দাবী করলো। (গুনিয়াতুত্তালিবিন, পৃ: ১৩২)

অতএব, ইসলমী বিধি-বিধানের বিপরীত কোন বিধি-বিধান তৈরি করার অর্থ হলো ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে যথার্থ মনে না করা। কাজেই ইসলামী জীবন বিধানের পরিবর্তে নিজেরাই একটি জীবন বিধান তৈরি করে মানব পরিচালনার চেষ্টা করা। অথচ মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আজ তোমাদের জন্য জীবন-বিধান পরিপূর্ন করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জীবন-বিধান নির্ধারণ করলাম। (সূরা মায়িদা, আয়াতঃ ৩)

দ্বীন ইসলামের সাথে গণতন্ত্রের সাংঘর্ষিক বিষয়

দ্বীন ইসলামের সাথে গণতন্ত্রের সাংঘর্ষিক বিষয় গুলো নিচে উল্লেখ করছিঃ

নং	ইসলাম কি বলে	গণতন্ত্র কি বলে
১	ইসলাম বলে, সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ।	গণতন্ত্র বলে, সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক জনগণ।
২	ইসলাম বলে, আইন-বিধান তৈরি করার ক্ষমতা কেবল মাত্র আল্লাহর।	গণতন্ত্র বলে, আইন-বিধান তৈরি করার ক্ষমতা কেবল মাত্র জনগণের।
৩	ইসলাম বলে, বিধান একমাত্র আল্লাহরই।	গণতন্ত্র বলে, জনগণের তৈরি সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন।
৪	ইসলাম বলে, আল্লাহ তা'য়ালা নির্দেশ দিয়েছে যে, তাঁকে ছাড়া আর কারো ইবাদত করা যাবে না। অর্থাৎ, অন্য কারো বিধান মানা যাবে না।	গণতন্ত্র বলে, গণতন্ত্রে তৈরি সংবিধানের সাথে অন্য কোন সংবিধান সাংঘর্ষিক হইলে, তা হইলে সেই সংবিধান যতখানি সাংঘর্ষিক ততখানি বাতিল হবে।
৫	ইসলাম বলে, যদি তুমি অধিকাংশ মানুষের অনুসরণ করো, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। অর্থাৎ অধিকাংশের সমর্থন করা যাবে না।	গণতন্ত্র বলে, অধিকাংশ মানুষের সমর্থনেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

৬	ইসলাম বলে, তোমরা দলে দলে বিচ্ছিন্ন হয়ও না।	গণতন্ত্র বলে, ভিন্ন ভিন্ন দল তৈরি করা যাবে।
৭	ইসলাম বলে, তোমরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে আল্লাহর রজ্জুকে ধর। অর্থাৎ সকল মুসলিমকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।	গণতন্ত্র বলে, এক জনপদে বিভিন্ন দল থাকতে পারে, তার একটি হবে প্রধান বিরোধী দল।
৮	ইসলাম বলে, ইসলামের মূল ভিত্তি আল্লাহর অভিপ্রায়।	গণতন্ত্র বলে, জনগণের মূল ভিত্তি জনমত।
৯	ইসলাম বলে, আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি আত্মসমর্পণ।	গণতন্ত্র বলে, সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ।
১০	ইসলাম বলে, সকল ক্ষমতার উৎস আল্লাহ।	গণতন্ত্র বলে, সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ।
১১	ইসলাম বলে, সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ।	গণতন্ত্র বলে, সার্বভৌমত্বের মালিক জনগণ।
১২	ইসলাম বলে, আল্লাহ প্রদত্ব সংবিধানেই রয়েছে মানবতার মুক্তি।	গণতন্ত্র বলে, মানব রচিত সংবিধানেই রয়েছে মানবতার মুক্তি।
১৩	ইসলাম বলে, মানুষ হিসেবে সকলেই সাধারণভাবে এসব অধিকার ভোগ করবে। কিন্তু যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও তাকওয়ার ভিত্তিতে গুণীজনেরা বিশেষভাবে মুল্যায়িত হবেন।	গণতন্ত্র বলে, মত প্রকাশে, ভোট দানে ও নির্বাচনে জাতী, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার স্বীকৃত।
১৪	ইসলাম বলে, উত্তরাধিকার ও নির্বাচিত হবার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষে প্রভেদ বিদ্যমান।	গণতন্ত্র বলে, উত্তরাধিকার ও নির্বাচিত হবার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়ই সমান বিবেচিত।
১৫	ইসলাম বলে, শক্তি ও মেধায় তারতম্যের কারণে নারী ও সংখ্যালঘুরা সংরক্ষণ নীতির অধীনে ভোগ করবে বিশেষ অধিকার।	গণতন্ত্র বলে, নারী ও সংখ্যালঘুরা সমানাধিকার ভোগ করবে।
১৬	ইসলাম বলে, শাশ্বত আদর্শ ও নৈতিক মানসম্পন্ন পরমত সমাদৃত। অনৈতিক পরমত ইসলামে বর্জনীয়।	গণতন্ত্র বলে, পরমত সহিষ্ণুতা গণতন্ত্রের এক বিশেষ আদর্শ।

১৭	ইসলাম বলে, শাশ্বত বা প্রত্যাদিষ্ট বিধান গরিষ্ঠের সমর্থন ছাড়াই বৈধ।	গণতন্ত্র বলে, সংখ্যা গরিষ্ঠের সমর্থন সকল বৈধতার মানদণ্ড।
১৮	ইসলাম বলে, জাগতিক ও আধ্যাতিক উভয় ক্ষেত্রে চেতনা পরিব্যাপ্ত, এই অর্থে প্রগতি।	গণতন্ত্র বলে, জাগতিক উন্নয়নেই সকল চেতনা সীমিত এই অর্থে প্রগতি।
১৯	ইসলাম বলে, চরম জবাবদিহিমূলক সরকার পদ্ধতি।	গণতন্ত্র বলে, জবাবদিহিমূলক সরকার পদ্ধতি।
২০	ইসলাম বলে, আল্লাহ প্রদত্ত্ব আইন দ্বারা বিচারকার্য নিয়ন্ত্রিত।	গণতন্ত্র বলে, মানব রচিত আইন দ্বারা বিচার কার্য নিয়ন্ত্রিত।
২১	ইসলাম বলে, আল্লাহ প্রদত্ত্ব ওয়াহীর বিধান কর্তৃক মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত।	গণতন্ত্র বলে, সংবিধান কর্তৃক মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত।
২২	ইসলাম বলে, জীবনের সর্বস্তরে আল্লাহর ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটানোই ইসলামী মূল্য বোধের পরিচায়ক।	গণতন্ত্র বলে, জীবনের সর্বস্তরে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটানোই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিচায়ক।
২৩	ইসলাম বলে, ইসলামী বিশ্বাসে মানুষের প্রথম উপাধী খলিফা/প্রতিনিধি, কাজেই ইসলাম ও রাজনীতি অবিচ্ছেদ্য।	গণতন্ত্র বলে, গণতান্ত্রিক বিশ্বাসে ধর্ম অবশ্যই রাজনীতি বিবর্জিত। ধর্ম রাজনীতি থেকে আলাদা।

(উপরোক্ত পয়েন্টগুলো আত-ত্বরীক ইলা ইক্বমাতিদ দ্বীন গ্রন্থ হইতে সংগ্রহকৃত)

উপরোক্ত পয়েন্টগুলো ছাড়াও গণতন্ত্রের এমন আরো অনেক উক্তি রয়েছে। যা সম্পূর্ণভাবেই ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। যেমন, ধর্ম যার যার উৎসব সবার। হিন্দু-মুসলিম, ইহুদি-খ্রিষ্টান সকলের মান একই সমান, ইত্যাদি। গণতন্ত্রের এই সকল উক্তি ও বিধানগুলো যদি কেহ গ্রহণ করে তা হলে অবশ্যই সে শয়তানের ইবাদতকারীর অন্তর্ভুক্ত হইবে। কারণ গণতন্ত্র শয়তান প্রদত্ত একটি দ্বীন। আর শয়তান তার এই দ্বীনের মাধ্যমে তার মন্দ কর্মগুলো জমিনে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। কিভাবে শয়তান গণতন্ত্রের মাধ্যমে তার মন্দ কর্মগুলো পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়? তা বুঝতে হলে আরো জানতে হবে গণতন্ত্র বা অধিকাংশের সমর্থনের কুফল।

অধিকাংশের সমর্থনের কুফল

১ নং উদাহরণঃ আমরা কম-বেশি সকলেই জানি এই আসমান ও জমিনের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তা'য়ালা। আর আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আর তিনিই আল্লাহ, যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, ছয়দিনের মধ্যে। (সূরা হুদ, আয়াতঃ ৭)

এমন কি কাফির-মুশরিকরা মুখে স্বীকার না করলেও তারাও জানে এই আসমান ও জমিনের স্রষ্টা একমাত্র পরাক্রমশালী আল্লাহ। মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রসূল ﷺ কে বলেন, তুমি যদি উহাদেরকে জিজ্ঞেস কর, কে আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, উহারা অবশ্যই বলিবে, এইগুলি তো সৃষ্টি করিয়াছেন পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ। (সূরা যুখরুফ, আয়াতঃ ৯)

যেহেতু আসমান ও জমিনের স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালা, সেহেতু রাজত্বও মহান আল্লাহ তা'য়ালার। অতএব, যদি শয়তান মহান আল্লাহর সমকক্ষ দাবি করে অর্থাৎ দুনিয়ার রাজত্বের জন্য ভাগ বসায়, আর অধিকাংশ অকৃতজ্ঞ কাফিরদের সমর্থনে শয়তান ভোট করে বিজয় হয়। (নাউযুবিল্লাহ) তাহলে কি এই জমিনের মালিক শয়তান? এই দুনিয়ার বাদশাহী কি শয়তানের? (নাউযুবিল্লাহ) আর বাস্তবেও শয়তান তার প্রকৃত কাফির অনুসারীদের অধিকাংশের সমর্থন নিয়ে দুনিয়ার বাদশাহীর চেষ্টা করছে আর বর্তমানে হয়েছেও তাই। (নাউযুবিল্লাহ) যদিও তা অধিকাংশদের কাছে। মু'মিনদের কাছে নয়। অথচ মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আর আল্লাহরই বাদশাহী আসমান ও জমিনের, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরা আল ইমরান, আয়াতঃ ১৮৯)

২ নং উদাহরণঃ আমরা কম বেশি সকলেই জানি আল্লাহর রসূল ﷺ কখনোই নারীদেরকে নেতৃত্বের সর্বোচ্চ পদ দেন নাই। যদিও নারীদের জন্য মহান আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ দিয়েছেন অনেক মর্যাদা। আমরা যদি ইতিহাস দেখি তবে জানতে পারবো জাহিলিয়াত যুগে নারীদেরকে জীবন্ত কবর দিত। কারো কন্যা সন্তান হয়েছে এ খবর পেলে, সেই কন্যা সন্তানের পিতা সমাজের মানুষের কাছে মুখ লুকিয়ে রাখত। সেই কন্যা সন্তানের পিতা নিজের কন্যা সন্তানকে হত্যা করত।

এ ভেবে যে সকলেই জেনে যাবে তার কন্যা সন্তান হয়েছে। নারীদেরকে ভোগ্যসামগ্রী মনে করত। যখন যার ইচ্ছা নারীদেরকে উপভোগ করত। আবার ইচ্ছে হলেই তাকে ছুড়ে ফেলে দিত। এমন পরিস্থিতিতে নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন মহান আল্লাহ তা'য়ালা দ্বীন ইসলামের বিধান দিয়ে। অর্থাৎ যদি কেহ নারীদেরকে উচ্চ মর্যাদা দিয়ে থাকে তবে তা কেবল একমাত্র ইসলামই দিয়েছে। তাছাড়াও নারী ও পুরুষের একমাত্র স্রষ্টা মহান আল্লাহ তা'য়ালা। কাজেই তিনি অবশ্যই জানতেন কাকে কোন স্থানের নেতৃত্ব দিলে কল্যাণকর হবে। আর একথাও ঠিক যে, নারীগণ অত্যান্ত নরম মনের অধিকারী। কাজেই শয়তান তাদেরকে ধোকা দিয়েই অধিক সক্ষম হতে পারে। অতএব এখন যদি কোন নারী ও পুরুষের মধ্যে নির্বাচন দেয়া হয়। কে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নেতৃত্বে পদে থাকবে আর শয়তান তার অকৃতজ্ঞ কাফির অনুসারীদের অধিকাংশের সংখ্যা নিয়ে সেই নারীকেই সমর্থন করে। আর সংসদ সদস্যের অধিকাংশের সিদ্ধান্তে সেই নারীকেই বিজয়ী করা হয়। অতঃপর সেই নারীকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নেতৃত্বে পদে রেখে জাতির কল্যানের আশা করাটাও শয়তানের ধোকা। আর বর্তমানে এটাই হয়েছে বা হচ্ছে। অথচ আল্লাহর রসূল ﷺ এর ছাহাবী হযরত আবু বকর (রা:) থেকে বণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, সে জাতি কখনো কল্যাণ লাভ করতে পারে না, যে জাতি তার (রাষ্ট্রীয়) সর্বোচ্চ নেতৃত্বের পদ কোন মহিলার হাতে সোপর্দ করে। (ছহীহুল বুখারী, হাঃ ৪৪২৫)

৩ নং উদাহরণঃ আমরা কম-বেশি সকলই জানি অশ্লীলতা ইসলামে অবশ্যই বর্জনীয়। অথচ কোন গণতান্ত্রিক দেশে অধিকাংশ মানুষ বিক্ষোভ-মিছিল সমাবেশ করলো এই দাবীতে যে, তারা পতিতালয় অর্থাৎ বেশ্যা ভিত্তিক পেশার লাইসেন্স অর্থাৎ অনুমোদন তথা বৈধতা বা হালাল করতে চায়। এখন এটা হারামই থাকবে? না, হালাল করবে এই উদ্দেশ্যে সংসদে সংসদ সদস্যগণ একত্রিত হয়েছে এবং সেই প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়েছে, আর সেখানেও অধিকাংশ অধিকাংশ সদস্যই মত দিয়েছে, যেহেতু এটাও একটি ব্যবসা সেহেতু তার লাইসেন্স দেওয়া হোক। অবশ্যই সংসদ স্পীকার তা অনুমোদন দিতে বাধ্য। কাজেই ইসলাম ঘোষিত একটি হারামকে সংসদে অধিকাংশদের সমর্থনে হালাল করা হইলো যা বর্তমানেও এরূপই হয়েছে বা হচ্ছে। (নাউযুবিল্লাহ)

অথচ মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আর যিনার নিকটবর্তীও হইও না, ইহা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। (সূরা বানী ইসরাইল, আয়াত: ৩২)

৪ নং উদাহরণঃ আমরা কম-বেশি সকলেই জানি অভিশপ্ত ইবলীস আদম সন্তানের প্রকাশ্য শত্রু। সেই সর্বপ্রথম অহংকার বশত, আমাদের আদি পিতা আদম (আঃ) এর বিরোধীতা করেছে। এবং পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ পালনে অবাধ্য হয়েছে। সে বলেছিল, হে রব তুমি যখন আমার কুফুরির জন্য আমাকে বিতারিত করলে, তখন আমিও তোমার এই আদম সন্তানদের আমার অনুসারী করার জন্য তোমার সরল পথে ওঁৎ পেতে বসে থাকব। যেন তারা তোমার সরল পথে না যেতে পারে। প্রয়োজনে আমি আমার চতুরমুখি ষড়যন্ত্র দ্বারা তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব। এক্ষেত্রে আমি আদম (আঃ) এর সন্তানদের অধিকাংশ সংখ্যাটিকেই তোমার প্রতি অকৃতজ্ঞ করে রাখব। কারণ আমি এই আদম (আঃ) এর কারণেই বিতারিত হয়েছি। এখন প্রশ্ন হইতে পারে শয়তান যদি, আদম (আঃ) এর অধিকাংশ সন্তানকে পথভ্রষ্ট করে তার অনুসারী করতে পারে? তবে কেন আল্লাহ তা'য়ালা আদম (আঃ) এর অধিকাংশ সন্তানকে হেদায়েত দান করে সরল পথে নেবে না? এই প্রশ্নটা নিতান্তই বোকা লোকদের প্রশ্ন। কেননা, আমরা জানি যে মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে জ্ঞান বুদ্ধি ও ইচ্ছা শক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, গরু-ছাগলের মত জ্ঞান-বুদ্ধিহীন করেননি। কাজেই আমাদেরকে কিভাবে দুনিয়াতে জীবনযাপন করতে হবে, অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধি করতে হবে এই সকল সবই যদি জানি, তবে এটাও জানার কথা যে, আমাদের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন, যিনি পরাক্রমশালী আল্লাহ। আর আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে এমনিতেই সৃষ্টি করেন নাই। সৃষ্টির কোন না কোন কারণ আছে। আর সেই কারণটা কি? সেই ব্যক্তি সেই কারণটার সন্ধান করে না, নিজের খেয়াল খুশির ও শয়তানের ওয়াছ ওয়াছায় চলাফেরা করে। তাদেরকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বিতারিত সেই শয়তানের ভ্রষ্ট পথের দিকেই ছেড়ে দেয়। আর যে ব্যক্তি তাকে সৃষ্টির কারণ সন্ধান করে এবং মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'য়ালার আনুগত্যের মাধ্যমে চলাফেরা করার চেষ্টা করে। তাদেরকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা সরল পথের দিকেই নিয়ে যান। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, কেহ দান করিলে, মুত্তাকী হইলে এবং যাহা উত্তম তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে, আমি তাহার জন্য সুগম করিব সহজ পথ।

এবং কেহ কার্পণ্য করিলে ও নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করিলে, আর যাহা উত্তম তাহা অস্বীকার করিলে, তাহার জন্য আমি সুগম করিব কঠোর পথ। (সূরা লায়ল, আয়াতঃ ৫-১০)

অর্থাৎ মানুষ এই দুনিয়ার খনিকের ভোগ বিলাসের মোহে পড়ে নিজের অস্তিত্ব ও মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'য়ালার কথা ভুলে রয়েছে। আর এরূপ মানুষের সংখ্যাই বেশি। কারণ ইসলামের পথটা দুনিয়ার ভোগ-বিলাস মুক্ত পথ।

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দুনিয়া মু'মিনদের জন্য কারাগার আর কাফিরদের জন্য ভোগ-বিলাসের স্থান। (মুসনাদে আহ্‌মাদ) আর দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষই ভোগ-বিলাসিতার পেছনেই ছুটে। আর এই সকল মানুষদের অধিকাংশের সমর্থন নিয়েই শয়তান তার কর্মগুলো পৃথিবীতে বাস্তবায়নের চেষ্টা করে যাচ্ছে। যেমন, কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অধিকাংশ মানুষ বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করলো। নারীদের পর্দার জন্য বাধ্য করা যাবে না। যদিও তারা মুসলিম। এখন সেই বিষয়টি অর্থাৎ মুসলিম নারীদের উপর পর্দা করার ফরজ বিধানটি বাতিল করবে? কি করবে না, এই বিষয়টি নিয়ে সংসদ সদস্যগণ সংসদে বসেছে। এবং আলোচ্য বিষয়টি উপস্থাপন করেছে। এখন সংসদে অধিকাংশ সদস্যগণের সমর্থন হলো, নারীদের উপর পর্দা করার ফরজ বিধানটি বাতিল করার পক্ষে। (নাউযুবিল্লাহ) আর সংসদের প্রধান স্পীকার অধিকাংশের সমর্থনে আল্লাহর হুকুম বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। পর্দা যার যার ব্যক্তিগত বিষয়। এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা বা জবরদস্তি করা যাবে না। অথবা একটি অজুহাত দেখিয়ে কৌশলে সিদ্ধান্ত নিলো যে, দেশে পর্দা ব্যবহারের মাধ্যমে নারীদের দ্বারা অনেক চুরাকারবারের ব্যবসা হচ্ছে। আসল অপরাধী সনাক্ত করাও কঠিন হয়ে গেছে নারীরা পর্দা ব্যবহারের কারণে। কাজেই আসল অপরাধী সনাক্ত করতে নারীদের পর্দা ব্যবহার বাতিল করা হচ্ছে। আর বর্তমানে আল্লাহর বিধান বাতিল করে শয়তানের বিধান চালু করা হয়েছে বা হচ্ছে। অথচ আল্লাহর তা'য়ালা বলেন, আর মু'মিন নারীদেরকে বল, তাহারা যেন তাহাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাহাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, তাহারা যেন যাহা সাধারণত প্রকাশ থাকে তাহা ব্যতিত তাহাদের আবরণ প্রদর্শন না করে, তাহাদের গ্রীবা ও

বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে, তাহারা যেন তাহাদের স্বামী, পিতা, শশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাই এর পুত্র, বোনের পুত্র, আপন নারীগণ তাহাদের মালিকানাধিন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন-কামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতিত কাহারো নিকট তাহাদের গোপন আবরন প্রকাশ না করে, তাহারা যেন তাহাদের গোপন আবরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে মু'মিন গণ! তোমরা সকলে আল্লাহর বিধানের দিকে ফিরে আস, যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার। (সূরা নূর, আয়াতঃ ৩১)

৫ নং উদাহরণঃ আমরা কম-বেশি সকলেই জানি, ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও নারীদের অবদান অনেক। কারণ একটি নারী তার পরিবারের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। আর সেই নারী তার সন্তানদের প্রথম শিক্ষিকা। আর সর্বপ্রথম মায়ের নিকট থেকেই সন্তান শিষ্টাচার শিক্ষা করে। আর সেই মায়ের মধ্যে যদি থাকে ইসলামী আদর্শ, তবে তা থেকে সন্তান ও ইসলামী আদর্শে আদর্শিত হয়ে উঠে। ফলে সেই সন্তানগুলো যৌবনে ধাবিত হলেও সমাজের অশ্লীল কর্মকাণ্ড দেখে ঘৃনা ও লজ্জাবোধ করে। পরিবারের দীর্ঘ দিনের শিক্ষা ও আদর্শের প্রতি অটুট থাকে। কাজেই সেই সন্তান যখন কোন সন্তানের পিতা বা মা হয়। তখন তার সন্তানদের কেও সে একই আদর্শে আদর্শিত করে তুলতে সক্ষম হয়। অনুরূপভাবে শয়তান যদি কোন নারীকে ধোকা দিয়ে তার অনুসারী করতে পারে, তবে শয়তানের কর্ম বাস্তবায়নের কাজটাও অনেকাংশে সহজ হয়ে যায়। আর শয়তানের সেই কাজকেই সহজে বাস্তবায়ন করার জন্য শয়তান তার অকৃতজ্ঞ অধিকাংশ অনুসারীদের অন্তরে ওয়াছ ওয়াছা দেয়। যেমন, কোন গণতান্ত্রিক দেশে শয়তানের অকৃতজ্ঞ অনুসারীরা শয়তানের উস্কানিতে বিক্ষোভ মিছিল ও গণসমাবেশ করে। এই দাবি আদায়ের জন্য যে "নারী-পুরুষের সমান অধিকার চাই" যার অর্থ এই দাড়ায় যে, পুরুষরা যেমন স্বাভাবিক পোশাক পরিধান করে বাজার-ঘাটে চলাচল করতে পারে। আমরাও তেমন ছোট-খাটো পোশাক পড়ে বাজার-ঘাটে চলাচল করব। পুরুষরা যেমন তাদের স্ত্রী-সন্তানদের বাড়িতে রেখে মার্কেট করতে যায়, আমরাও তেমন স্বামী/পিতাকে বাড়িতে রেখে মার্কেটে যেতে চাই। পুরুষেরা যেমন মিছিল মিটিং গণসমাবেশে অংশ গ্রহণ করতে পারে। তেমন ভাবে আমরাও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে

অংশ গ্রহণ করতে চাই, বোরকা পড়ে চার দেয়ালের মাঝে আর বন্দি থাকতে চাইনা। এমন অনেক স্লোগান তাদের শোনা যায়। এক কথায় সমান অধিকারের নামে যত অসভ্যতা ও বেহায়াপনা আছে তারা তা করতে চায়। অর্থাৎ, শয়তান তার উস্কানি দিয়ে নারীদের মাঝে যত উলঙ্গপানা ছড়িয়ে দিতে পারে। এ প্রসঙ্গে মুফতি মুহাম্মাদ শাফী (রহি:) বলেন, মানুষের বিরুদ্ধে শয়তানের সর্বপ্রথম আক্রমনের ফলে তার পোশাক খসে পড়েছিল। আজও শয়তান তার শিষ্যবর্গের মাধ্যমে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছায় সভ্যতার নামে সর্বপ্রথম তাকে উলঙ্গ বা অর্ধউলঙ্গ করে (রাজ) পথে নামিয়ে দেয়। শয়তানের তথাকথিত প্রগতি, নারীকে লজ্জা-শরম থেকে বঞ্চিত করে সাধারন্যে অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় নিয়ে আসা ছাড়া অর্জিতই হয় না। (তাফসিরে মা'রিফুল কুরআন, পৃ:৪৩৪)

অতঃপর যখন তারা তাদের দাবি বাস্তবায়নের জন্য রাস্তায় নেমে পড়ে। তখন সংসদে সংসদ সদস্যগণ নারীদেরকে সমান অধিকার দেওয়া যাবে কি যাবে না? সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সংসদে প্রস্তাব উপস্থাপন করে। কাজেই সেখানেও অধিকাংশদের সমর্থনে এই পরামর্শ আসে যে, নারীদেরকে সমান অধিকার দেওয়া হোক। ফলে সংসদের প্রধান স্পীকার এই ঘোষনা দেয় যে, নারীরাও মানুষ কাজেই নারীদেরকেও পুরুষদের মতই অধিকার দেওয়া হলো। অর্থাৎ সমান অধিকার দেওয়া হলো সকল বিষয়ে। (নাউযুবিল্লাহ), আর বর্তমানেও এটাই হয়েছে বা হচ্ছে। অথচ মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের উপর পুরষদের। কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা আছে, আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা বাকারাহ, আয়াতঃ ২২৮)

একটি বহুল প্রচলিত গল্প

নারীদের দিয়ে শয়তানের এই সমান অধিকার চাই, এই শ্লোগানের প্রেক্ষিতে একটি বহুল প্রচলিত গল্প মনে পড়ে যায়। "একটি এলাকায় ছোট একটি বন ছিলো। আর তার পাশেই ছিলো একটি বাড়ি। যদিও বাড়িটি থেকে অল্প কয়েক গজ দূরেই ছিলো একটি ছোট গ্রাম। একক সেই বাড়ির মালিকটি ছিলো দিন

মুজুরী। অল্প আয় হলেও ছোট পরিবার নিয়ে ভালোই চলত তারা। তাছাড়া তার স্ত্রীও ছিলো খুবই কর্মঠ। কাজেই সেই বাড়িতে কিছু হাঁস-মুরগী পালন করত। তবে অনেক ভয়ে ভয়েই তাকে হাঁস-মুরগী পালন করতে হতো। কারণ তার বাড়িটির সাথেই ছিলো বন। আর সেই বনেই থাকত শিয়াল, বেজি, বড় বিড়াল ইত্যাদি জাতীয় প্রানী। যদিও তাদের দ্বারা মানুষের প্রতি আক্রমনের আশঙ্কা ছিলো খুবই কম। কিন্তু হাঁস-মুরগী তো ছেড়ে দিয়ে পালনের কোনই উপায় ছিলো না। কাজেই তারা লোহার একটি খাচাতেই তা লালন-পালন করত। কিন্তু তা আর কতদিন? হাঁস-মুরগীর গন্ধ অনেক দূর থেকেও পেয়ে যায় এ সকল প্রানীগুলো। একদিন একটি শিয়াল এ বাড়িটির সামনে এসে দেখতে পায়, বাড়িটির পিছন পাশেই বেলকনিতে রয়েছে বেশ কিছু হাঁস-মুরগী। দেখেই শিয়ালের জিভে জল। কিন্তু নেয়ার কোনই উপায় নেই। কাজেই সে চুপে চুপে বেলকনির সামনে গিয়ে দাড়ায়। এবং বিভিন্ন ময়লা-আবর্জনা নিয়ে খেলা করতে থাকে। ঠিক যেমন বিড়ালরা খেলা করে। হঠাৎ সেই বেলকনিতে থাকা হাঁস-মুরগী গুলো থেকে একটি বড় জাতের মুরগীর চোখ পড়ে যায় শিয়ালের দিকে। মুরগীটি তখন তাকে চিনতে না পেরে জিজ্ঞাস করে, কে তুমি? শিয়াল তখন বুদ্ধি খাটিয়ে বলে, আমি তোমার বন্ধু। মুরগীটি বলে, ওখানে কি করছো? শিয়াল বলে, খেলা করছি। মুক্ত মাঠে, কারণ আমার তো নিজের স্বাধীনতা আছে- তাই। মুরগীটি ছিলো খুবই সহজ-সরল কাজেই সে আফসোস করে বলল, আমি ও যদি তোমার মত খেলতে পারতাম। এটা তো তুমিও পারবে, তোমার মত অনেকেই আছে যারা এমনভাবে খেলা করে, সুন্দর সুন্দর খাবার খায়, আবার মাঝে মাঝেই পাখনা দুটি মেলে শূণ্যতেও উড়ে। মুরগীটি শিয়ালের কথা শুনে তো আনন্দে মেতে উঠেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার চেহারাই আবার হতাশার চিহ্ন। শিয়াল বলল, তোমার জন্য আফসোস বন্ধু, কারণ তোমাকে তো তোমার মালিক বন্দি করে রেখেছে। আর তাছাড়া বন্ধি হয়ে থাকাটা খুবই কঠিন, আমি যদি তোমার স্বাধীন জীবন লাভের জন্য কিছু করতে পারতাম! আচ্ছা বলো তো বন্ধু; তুমি কী সকল সময়েই বন্দী থাকো? না মাঝে মাঝে ছেড়েও দেয়? মুরগীটি বলল মাঝে মাঝে ছেড়েও দেয়। তবে তা খুবই কম সময়ের জন্য। শিয়ালটি হু-হু-করে হেসে উঠে বলল, এটাই তোমার জন্য যথেষ্ঠ। তুমিও ডানামেলে আকাশে উড়তে পারবে, সুন্দর

সুন্দর খাবার খেতে পারবে। তুমি স্বাধীনতা পাবে অন্যদের মত। আর তোমারো থাকবে অনেক স্বাধীন সঙ্গী-সাথী। মুরগীটি বলল, আমি কোথায় পাবো এগুলো? আমি তো জানি না। শিয়াল বলল, আমি তোমাকে তাদের কাছে নিয়ে যাবো। কারণ আমিও তো তোমার বন্ধু। আর বন্ধু হয়ে যদি বন্ধুর উপকারে না-ই আসতে পারি, তবে বন্ধু হয়ে লাভ কি বলো। মুরগী বলল, কিন্তু!!! শিয়াল বলল, আর কোন কিন্তু নেই, এখন শুধু সুযোগের অপেক্ষা। কাল যখনই তোমাকে ছেড়ে দিবে, তখনই তুমি পালিয়ে এসে ঐ গাছটির নিচে লুকিয়ে থাকবে। কালকে আমি একদম ঠিক সময়ে এসে তোমাকে তোমার অন্যান্য বন্ধুদের কাছে নিয়ে যাবো। সেখানে তুমি তোমার স্বাধীন জীবন উপভোগ করবে। মুরগীকে আর কোন কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই সেখান থেকে চলে গেলো শিয়াল। তখন থেকেই সহজ-সরল মুরগীটি পড়ে গেলো চিন্তায়। কখনো সে ভাবে, এই জীবনটাই কি ভালো? এ স্বাধীন জীবনের চেয়ে? আবার কখনো ভাবে, নাকি স্বাধীন জীবনটাই ভালো? এই বন্দি জীবনের চেয়ে এমন চিন্তা করতে করতেই তার রাতটা কেটে গেলো, চলে আসলো সেই সময়, যখন তার মালিক তাকে ছেড়ে দিয়েছে কিছু সময়ের জন্য, তখনও ভাবছিলো সে এখন কি করবে? আবার সে ভাবছে তার নতুন বন্ধুটির কথা, যে তাকে বন্ধি জীবন থেকে মুক্ত জীবনে নিয়ে যেতে চায়। সেই বন্ধুটিকে তো আমি ওয়াদা দিয়ে ফেলেছি। কাজেই বন্ধুকে দেওয়া কথাটিও এখন আমার রক্ষা করতে হবে। মুরগীটি সুযোগ মত পালিয়ে যায়। সেই বাড়ি থেকে, সেই গাছের নিচে, যেখানে তার নতুন বন্ধু যেতে বলেছে। ঠিক সময় মত শিয়ালটিও সেখানে উপস্থিত। এবার শিয়ালটি মুরগীটিকে সামনে সামনে চলতে বলে। শিয়াল মুরগীটির পথের দিশা দিতে দিতে মুরগীটির পেছনে পেছনে চলে। শিয়ালটি মুরগীটির বন্ধু সেজে মুরগীটিকে ঠিক বনের মাঝখানে এনে, শিয়ালটি হু-হু করে ডেকে উঠে। শিয়ালটির অন্য সকল বন্ধুরা তার আহবান বুঝতে পেরে দৌড়ে এসে মুহুর্তের মধ্যেই ঘিরে ফেলে মুরগীটিকে এবং আনন্দের সুরে গান গাইতে থাকে মুরগীটির সামনে। মুরগীটি করুণ ও ভীত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে তার বন্ধুবেশধারী শত্রু শিয়ালটি সহ আরো অনেক শিয়াল ঘিরে আছে তার চোখের দিকে। মুরগীটি তার পরিচিত শিয়ালটির দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকে শুধু একটি কথাই বলল, তুমিই তো আমাকে বলেছিলে, সমান অধিকারের

শ্লোগান দিতে, আর তুমিই তো আমাকে বলেছিলে, স্বাধীন জীবন উপভোগ করাবে, আর তা অনেক আনন্দদায়ক জীবন। আর এখন তুমিই তোমার বন্ধুদের সাথে নিয়ে আমাকে ছিড়ে ছিড়ে খেতে চাও? আমার স্বাদ উপভোগ করতে চাও? কিন্তু শিয়ালগুলো মুরগীটির কোন কথাই কানে নিলো না। মুহূর্তের মধ্যেই সকল শিয়ালগুলো মুরগীটির উপর ঝাপিয়ে পড়ে ছিড়ে ছিড়ে খেলো।

ইসলামের বিধানেই শান্তি

প্রিয় পাঠক, উপরের গল্পটি পড়ে এতক্ষণে হয়তো বুঝতেই পেরেছেন, আমি কি বুঝাতে চেয়েছি। হ্যাঁ, সত্যিই আজকে আমাদের সমাজেও আমাদের সম্মানিতা নারীদের এই মুরগীটির মতই করুণ পরিনতি হয়েছে। তাদেরকে সমান অধিকারের শ্লোগান শিখিয়েছে। যখন তারা এই শ্লোগান দিয়ে বাড়ির বাহিরে চলে যায়। ঠিক তখনই বন্ধুরূপী বখাটে শিয়ালগুলি ঝাপিয়ে পড়ে নারীদের প্রতি। কাজেই ক্রমান্বয়েই বাড়ছে ধর্ষণ ও যেনার মত ঘৃণিত পাপ। কাজেই নারীদের উচিৎ শিয়ালরূপী বন্ধুদের মানব রচিত বিধানকে লাথি মেরে আল্লাহর তৈরী ইসলামী বিধানের দিকে দৌড়ে আসা। কারণ এখানেই শান্তি, এখানেই মুক্তি, এখানেই আপনাদের সম্মান, এখানেই আপনাদের মর্যাদা। অন্য কোথাও মুক্তি নেই, আমি এখানে গণতন্ত্রের ৫টি সাধারণ উদাহরণ উল্লেখ করেছি। আরো অনেক ঘৃণিত ঘৃণিত উদাহরণও উল্লেখ করা যাবে। কিন্তু আমি বইটিতে অধিক পৃষ্ঠা যুক্ত করতে ইচ্ছা না করায়, সাধারণ ৫টি কুফল আলোচনা করেছি। আর অধিকাংশের সমর্থনেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত উক্তিটিতে শয়তানের এটাই সবচেয়ে বড় লাভ যে যুদ্ধ করা ছাড়াও তার অধিকাংশ অনুসারীদের সমর্থনে পৃথিবীতে তার কুকর্মগুলো প্রতিষ্ঠিত করতে পারছে। কাজেই যেই সকল মানুষগণ তার এই ঘৃনিত কর্মগুলো পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করতে অধিকাংশের সমর্থন দিয়ে বা যেকোন ভাবে তাকে সাহায্য করবে, তারা সকলেই শয়তানের অনুসারী। তবে যারা তা না জেনে, না বুঝে করবে, তাদের জন্যও মহান আল্লাহ তা'য়ালার নিকট শাস্তি আছে, যদি তাওবা না করে মারা যায়। তবে তাদের চেয়ে এদের কম শাস্তি হবে যারা জেনে বুঝে করছে অথবা যাদের অন্তরে মহর মারা বুঝালেও বোঝে না, অন্ধের মত শয়তানের কুকর্মগুলো সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। যদি আরো একটু স্পষ্টভাবে

জানতে চান তবে বলব, যারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজে নেতৃত্ব দিচ্ছে, সেই সকল নেতা-কর্মীদের চেয়ে সাধারণ ভোট দাতা, যারা না বুঝে ভোট দিচ্ছে তাদের শাস্তি কম হতে পারে (আল্লাহ আলিম), অতএব তারা সকলই মুসলিম হোক অথবা অমুসলিম হোক। তবে সাধারণ ভোটারদের কানে যখনই পৌছাবে যে গণতন্ত্র হারাম। ঠিক তখনই তাকে তাওবাহ করে গণতন্ত্র থেকে ফিরে আসতে হবে। আর তাকে সঠিকটা যাচাই করতে হবে। যদি তারা এটা না করে তবে নেতা-কর্মী ও সাধারণ ভোটার সকলের জন্যই সমান শাস্তি।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, অতঃপর, যাহারা অজ্ঞাত বসত মন্দ কাজ করে তাহারা পরে তাওবা করলে ও নিজেদেরকে সংশোধন করিলে তাহাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালক অবশ্য অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা নাহল, আয়াতঃ ১১৯)

যেহেতু গণতন্ত্রকে শয়তানের দ্বীন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে, সেহেতু গণতন্ত্রের অনুসারী ও গণতন্ত্রের সমর্থক উভয়ই শিরকী গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। সে মুসলিম হোক আর অমুসলিম হোক। শিরককারী মুসলিমদের মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, তাদের অধিকাংশ আল্লাহে বিশ্বাস করে, তবে তাঁহার অর্থাৎ আল্লাহর সাথে শরিকও করে। (সূরা ইউসুফ, আয়াতঃ ১০৬)

গণতন্ত্রে অনুসরণ ও সমর্থন করা যদিও শিরকী গোনাহ তবে কেহ যদি না বুঝে গণতন্ত্রের সমর্থন করে যায়, অতঃপর তার কাছে খবর পৌছে যে, গণতন্ত্র হারাম। তা হইলে সে যদি তৎক্ষণাৎই তা বর্জন করে এবং খাটি মনে আল্লাহর কছে তাওবাহ করে তবে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, তিনিই তাঁহার বান্দাদের তাওবাহ কবুল করেন ও পাপ মোচন করেন এবং তোমরা যাহা কর তিনি তাহা জানেন। (সূরা শূরা, আয়াতঃ ২৫)

উপরোক্ত আলোচনা "গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা" পয়েন্ট থেকে আমরা বুঝতে পারলাম গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে শুধু মাত্র শয়তানের কুকর্মগুলোই প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং আল্লাহ তা'য়ালার ইসলামী বিধানকে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে প্রত্যাখান করা হয়। কাজেই ইসলামের পরিবর্তে অন্য কোন দ্বীন বা বিধান গ্রহণ করা হারাম এবং আল্লাহ তা'য়ালার সাথে কুফুরির অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ তা'য়ালা

বলেন, আর যারা কুফুরি করেছে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। (সূরা ফাতির, আয়াতঃ ৩৬)

গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করা

অনেকেই এই চিন্তা নিয়ে থাকেন যে, যদিওবা গণতন্ত্র হারাম তবুও কৌশল অবলম্বন করে গণতন্ত্রের সঙ্গে থেকে গণতন্ত্রের মাধ্যম দিয়ে মূলত ইসলামী বিধানকে রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করব। আর যদি একবার রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তবে গণতন্ত্র এমনিতেই ধ্বংস হয়ে যাবে, অথবা গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে সময় লাগবে না। এই সকল চিন্তা কেবল সাধারণ মুসলমানদের অন্তরে আছে শুধু তা নয় বরং বড় বড় আলেমদেরও এমন চিন্তা রয়েছে এবং এই চিন্তায় তারা গণতন্ত্রের সাথে একথা ঘোষনা দিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজও করে যাচ্ছেন। যা একটি বড়ই ভুল চিন্তা ও ভুল সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তে মুসলমানদের ক্ষতি ছাড়া কোনই লাভ নেই। আর এইভাবে রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। হ্যাঁ, তবে তারা নির্বাচনের মাধ্যমে বিজয়ী হয়ে কিছু সময়ের জন্য শাসন ক্ষমতায় থাকতে পারেন। তবে রাষ্ট্রে ইসলামী বিধান কায়েম করতে পারবেন না। কেন তারা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না? আর তা না পারার কারণ হলো- তারা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায়। যেই শব্দের উচ্চারণের প্রথমেই গণতন্ত্র আর পরে ইসলাম। আর এই দেশটা ইসলামী দেশ নয় বরং গণতান্ত্রিক দেশ। আর আমি ‘‘গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা’’র আলোচনায় উল্লেখ করেছি গণতন্ত্র একটি বিধান প্রনেতা আর ইসলামের বিধান প্রনেতা আল্লাহ। গণতন্ত্রের পরিচালক শয়তান। আর ইসলামের পরিচালক স্বয়ং আল্লাহ। সুতরাং এই দুইটির মধ্যে যেকোন একটি গ্রহণ করলেই অপরটিকে এমনিতেই প্রত্যাখ্যান করা হয়ে যায়। কখনই দুইটি একসাথে গ্রহণ করা হয় না। আল্লাহ তা’য়ালা বলেন, ইসলাম আল্লাহর কাছে মনোনীত বিধান। (সূরা আল-ইমরান, আয়াতঃ ১৯) অন্যথায় মহান আল্লাহ তা’য়ালা বলেন, হে মু’মিনগণ! তোমরা পরিপূর্ণ ভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পথ অনুসরণ করিও না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সূরা বাকারাহ, আয়াতঃ ২০৮)

অর্থাৎ, ইসলাম মানতে হলে পরিপূর্ণ ভাবেই মানতে হবে। যে কেউ ইসলামের সাথে ইসলামের সাংঘর্ষিক অন্য কিছুও মানতে যাবে, সে শয়তানের পথই অনুসরণ করতে থাকবে। কাজেই আল্লাহ তা'য়ালা এটাও সেই আয়াতেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, শয়তান আমাদের প্রকাশ্য শত্রু। অতএব, বিন্দুমাত্রও শয়তানের পথ অনুসরণ করা যাবে না। আর শয়তানের কয়েকটি পথের মধ্যে অন্যতম ও প্রধান একটি পথ হলো 'গণতন্ত্র'। এই পথটির মাধ্যমেই শয়তান কেবল ক্ষণিকের সফলতা পেয়েছে। কাজেই শয়তানের পথের সাথে আল্লাহর পথকে মিলিত করার কাজ কখনোই মুসলমানের হতে পারে না। ইসলামের পথের সাথে শয়তানের পথ মিলিত করাটার চেষ্টা ইতিপূর্বে কেবল কাফিররাই করেছে। মক্কা নগরীতে একদল কাফির প্রতিনিধি যখন আল্লাহর রসূল ﷺ এর কাছে প্রস্তাব রাখলেন, হে মুহাম্মদ! আসুন আমরা এই চুক্তি করি যে, এক বছর আপনি আমাদের দ্বীন পালন করবেন আর এক বছর আমরা আপনার দ্বীন পালন করব। উক্ত প্রস্তাবকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা ওয়াহীর মাধ্যমে বাতিল ঘোষনা করে ছিলেন। আল্লাহর রসূল ﷺ ওয়াহী পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন, হে কাফির সম্প্রদায়! আমি ইবাদাত করিনা তোমরা যার ইবাদাত কর। এবং তোমরাও ইবাদাতকারী নও যার ইবাদাত আমি করি এবং আমি ইবাদাতকারী নই যার ইবাদাত তোমরা কর, আর তোমরা ইবাদাতকারী নও যার ইবাদাত আমি করি, সুতরাং তোমাদের দ্বীন তোমাদের জন্য আর আমার দ্বীন আমার জন্য। (সূরা কাফিরূন, আয়াতঃ ১-৬)

উক্ত সূরাটির মাধ্যমে আল্লাহর রসূল ﷺ কাফিরদের দেওয়া প্রস্তাবটি প্রত্যাখান করেছিলেন আজ থেকে প্রায় ১৪ শত বছর পূর্বেই। আর ১৪ শত বছর পর এসে যারা ৫ বছরের জন্য ইসলাম ও গণতন্ত্রকে ভাগাভাগি করে পালন করতে চায়। তাদের চিন্তা ও সিদ্ধান্তটা অবশ্যই মুসলিমের জন্য বড় লজ্জা ও বিপদজনক। একটি কথা মনে রাখা খুবই জরুরী যে, জমিন যেহেতু আল্লাহর সেহেতু আল্লাহর জমিনে একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালারই বিধান ও কর্তৃত্ব থাকবে। আল্লাহর জমিন শয়তানের সাথে ৫ বছরে জন্য ভাগাভাগি করার কোন চিন্তা আসাটাও ঈমানের দুর্বলতা। মনে রাখতে হবে, জমিন আল্লাহর। সে জমিনের ক্ষণিকের বাদশাহী শয়তান করছে ঠিকই কিন্তু শয়তান ও তার অনুসারীদের নিকট থেকে সশস্ত্র যুদ্ধ করে সেই জমিন ছিনিয়ে নিয়ে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করার পরীক্ষাতেই মুমিনের

সফলতা ইহকাল ও পরকালে। এই কথা ভাবাটা ঈমান স্বল্পতার লক্ষণ যে, জমিনে যখন শয়তানের রাজত্বই চলত, তখন কোন রকম ঝামেলা ছাড়াই আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদেরকে একটু সুযোগ দিয়েছে এটাই অনেক। আবার অনেকে একথাও বলতে পারেন যে, আমরা গণতন্ত্রকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করি না, শুধু কৌশল অবলম্বন করে তাদের সাথে আছি এতটুকুই। আপনাদের জানা প্রয়োজন সূরা কাফিরূন নাযিলের আরো একটি প্রেক্ষাপট রয়েছে,

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা:) বলেন, মক্কার কাফিররা পারস্পরিক শান্তির লক্ষে এই প্রস্তাব দিলো যে, আপনি আমাদের কোন প্রতিমার গায়ে কেবল হাত লাগিয়ে দিন, আমরা আপনাকে সত্য বলব। (তাফসিরে মা'রিফুল কুরআন, পৃ: ১৪৭৯)

যেখানে তাদের প্রতিমার গায়ে শুধু আল্লাহ রসূল ﷺ এর হাত লাগিয়ে দিতে বলেছে। তবুও আল্লাহর রসূল ﷺ তাদের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, আর আপনারা কৌশলের নামে গণতন্ত্রের সাথে যুক্ত হয়েই কাজ করছেন। আবার অনেকেই যুক্তির খাতিরে বলতে পারেন, আল্লাহ রসূল ﷺ কাফিরদের সাথে শান্তি চুক্তি করেছেন। আমরাও গণতন্ত্রের সাথে শান্তি চুক্তি করেছি। উক্ত যুক্তি খাটিয়ে শুধু মুসলিমদেরকে সান্তনা দেওয়া যায় কিন্তু ঈমানকে দৃঢ় করা যায় না। কারণ অনেক আগেই আল্লাহ তা'য়ালা বিধান দিয়ে দিয়েছেন কোন বিষয়ে কাফিরদের সাথে সন্ধি করা যায়, আর কোন বিষয়ে সন্ধি করা যায় না। যেই চুক্তিতে আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত হয়, সেই চুক্তি কখনোই ইসলাম অনুমোদন দেয় না। উক্ত যুক্তি খণ্ডনে মুফতী মুহাম্মদ শাফী (রহি:) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এর চুক্তি (হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি) দ্বারা যে শান্তি চুক্তির অনুমতি বা বৈধতা জানা যায়, তা সে সময় যেমন বৈধ ছিল, আজও তেমনি বৈধ আছে, বৈধতা আর অবৈধতার আসল কারণ হচ্ছে স্থান-কাল-পাত্র এবং সন্ধির শর্তাবলি। এক হাদিছে আল্লাহর রসূল ﷺ এর অর্থাৎ সন্ধির ফায়সালা দিতে গিয়ে বলেন- সে সন্ধি অবৈধ যা কোন হারামকে হালাল কিংবা হালালকে হারাম করে। কাজেই যখন কাফিরদের প্রস্তাবিত চুক্তি মেনে নিলে শিরক করা জরুরী হয়ে পড়ে। এজন্যই সূরা কাফিরুন এধরনের সন্ধি নিষিদ্ধ করেছে। পক্ষান্তরে ইহুদিদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিতে (হুদাইবিয়ার সন্ধিতে) ইসলামের মূলনীতির বিরুদ্ধে কোন বিষয় ছিলো না।

উদারতা, সদ্ব্যবহার ও শান্তি অন্বেষণে ইসলামের সাথে কোন ধর্মের তুলনা হয় না। কিন্তু শান্তি চুক্তি মানবিক অধিকারের ব্যাপারে হয়ে থাকে- আল্লাহ তা'য়ালার আইন ও ধর্মের মূলনীতিতে কোন প্রকার বরদাস্ত নয়। (তাফসিরে মা'রিফুল কুরআন, পৃ: ১৪৮১)

তবুও যদি যুক্তি খাটিয়ে হারাম চুক্তিকে হালাল করেন এবং গণতন্ত্রের সঙ্গ দিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করতে চান। সেখানেও সফল হতে পারবেন না। কারণ গণতন্ত্রের মাধমে পৃথিবীতে শয়তান তার কুকর্মগুলো প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। আর ইসলামের মাধ্যমে পৃথিবীতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা সৎকর্ম প্রতিষ্ঠিত করতে চান। সুতরাং, গণতন্ত্র এক জিনিস আর ইসলাম অন্য জিনিস। আপনারা যদি পৃথিবীতে সৎকর্ম প্রতিষ্ঠিত করতে চান আর আপনাদের হাতিয়ার হয় গণতন্ত্র। আর শয়তান যদি পৃথিবীতে কুকর্ম প্রতিষ্ঠিত করতে চায় আর তার হাতিয়ারও হয় গণতন্ত্র। তবে গণতন্ত্রের অর্থটা আপনাদের জানা খুবই জরুরী। গণতন্ত্রের অর্থ আমি সাধারণ ভাবেই উল্লেখ করছি।

গণতন্ত্র হলো, অধিকাংশের সমর্থনেই সিদ্ধান্ত। আর এটা আমি পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, অধিকাংশের সমর্থন যায় মন্দ কর্মের দিকে কারণ তারা শয়তান দ্বারা পরিচালিত হয়। আর কম সংখ্যকের সমর্থন থাকে সৎকর্মের দিকে। কারণ তারা আল্লাহর পথে পরিচালিত হয়। আর আপনারা গণতান্ত্রিক দেশে অধিকাংশের সমর্থন নিয়ে সৎকর্ম প্রতিষ্ঠা করবেন, এমনটি যদি হতো তবে কোন নাবী-রসূলই তাদের কম সংখ্যক ছাহাবীদেরকে নিয়ে অধিকাংশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করে সৎকর্ম প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করতেন না। কারণ আল্লাহর রসূলগণ কখনোই অন্যায়ভাবে রক্ত ঝড়া পছন্দ করতেন না। অথচ মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, হে নাবী; তুমি যুদ্ধ কর কাফির ও মুনাফিকদের সাথে, আর তাদের সাথে কঠোর পন্থা অবলম্বন কর। আর তাদের স্থান জাহান্নাম। (সূরা তাওবাহ, আয়াতঃ ৭৩)

তবুও যদি যুক্তির খাতিরে একথা মেনে নেওয়া যায় যে, গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করা যাবে। তাহলে "গণতন্ত্রের কুফল" পয়েন্টের আলোচনায় ৫টি উদাহরণ আমি উল্লেখ করেছি, গণতান্ত্রিক দেশে ঠিক শয়তান তার অধিকাংশের অনুসারীদেরকে রাজপথে নামিয়ে তাদের দাবি আদায়ের সর্বাত্তক চেষ্টা করবে,

ফলে তখন ইসলাম নামে গণতান্ত্রিক সরকার হয় সেই অধিকাংশ সমর্থনের আন্দোলনকারীদের দাবি মেনে নেবে। আর না হয়তো আন্দোলনকারীদেরকে গ্রেফতার ও গুলি করার আদেশ দিবেন। যার দরুন বাহির রাষ্ট্রগুলো এই সরকারকে আরো চাপ দিবে এবং ক্ষমতাচ্যুত করতে বাধ্য করবে। এমনটিই ঘটেছে মিশরে।

আমি আরো একটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করছি, এরূপ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের মাধ্যমে একটি ইসলামী সরকার ক্ষমতায় এসেছেন। আর সেই দেশের অধিকাংশ মানুষ রাস্তায় নেমে মিছিল মিটিং করছে তাদের দাবি পূরণের জন্য। তাদের দাবি এই যে, এই দেশে বিবাহিত কেহ যেনা বা ধর্ষণ করলে তাকে পাথর মেরে হত্যা করা যাবে না এবং চোর চুরি করলে তার হাত কাটা যাবে না। এই আইন বাতিল করতে হবে। আর উন্নয়নশীল দেশগুলো অ্যামেরিকা, ইউরোপের মত বা প্রতিবেশি দেশগুলোর মত কারাদণ্ড বা জরিমানার আইন পাশ করতে হবে। সেই ইসলামিক সরকার কোন ক্রমেই সেই আন্দোলন থামাতে পারছেনা। ইতিমধ্যেই জাতিসংঘ যা বাইতিশ শায়তান অর্থাৎ শয়তানের ঘর থেকে শয়তানের অনুসারীরা এবং অন্যান্য আরো গণতান্ত্রিক দেশগুলো থেকে বার্তা আসলো এবং শয়তানের তৈরি বর্তমানের বিশ্ব মানবাধিকার সংস্থা থেকেই সেই একই বার্তা আসলো। "মানুষের প্রতি বর্বরতা বন্ধ কর" তাদের হত্যা বা হাত কাটার পরিবর্তে কারাদণ্ড বা জরিমানার আইন পাশ কর। গণতান্ত্রিক অন্যান্য দেশগুলোর সংবিধান দিয়ে বিচার-কার্য্য প্রতিষ্ঠা কর। এই আদেশগুলো করছে শয়তানের অধিকাংশের পক্ষের অনুসারীরা এক কথায় কাফিররা। আর মহান আল্লাহ তা'য়ালা আদেশ করছেন, পুরুষ চোর ও নারী চোর তাহাদের হস্তচ্ছেদন কর, ইহা তাহাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর পক্ষ হইতে দৃষ্টান্তমূলক দণ্ড, আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। কিন্তু সীমালংঘন করার পর কেহ তাওবাহ করিলে ও নিজেকে সংশোধন করিলে অবশ্য আল্লাহ তাহার তাওবা কবুল করিবেন, আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা মায়িদা, আয়াতঃ ৩৮-৩৯)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন, সেই পথ অর্থাৎ (সূরা নিসার ১৫-১৬ নং আয়াত) ও যেনাকরার শাস্তি নির্ধারণ এই যে, বিবাহিত পুরুষ ও নারী এ অপরাধ

করলে তাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে এবং অবিবাহিত পুরুষ ও নারী করলে একশত বেত্রাঘাত করা হবে। (তাফসিরে মা'রিফুল, কুরআন পৃ: ৯২৬)

উমার ইবনু খত্তাব (রা:) রসূলুল্লাহ ﷺ এর মিম্বারে উপবিষ্ট অবস্থায় বললেন, আল্লাহ তা'য়ালা মুহাম্মাদ ﷺ কে সত্য সহ প্রেরণ করেন এবং তাঁর প্রতি কিতাব নাযিল করেন। কিতাবে যেসব বিষয়ে অবতীর্ণ করা হয় তার মধ্যে পাথর মেরে হত্যার বিধানও ছিলো, যা আমরা পাঠ করেছি, স্মরণ রেখেছি এবং হৃদয়ঙ্গম করেছি। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ ও পাথর মেরে হত্যা করেছেন এবং তাঁর পরে আমরাও করেছি। এখন আমি আশঙ্কা করছি যে, সময়ের চাকা আবর্তিত হওয়ার পর কেউ একথা বলতে না শুরু করে যে, আমরা পাথর মেরে হত্যার বিধান আল্লাহর কিতাবে পাই না। ফলে সে একটি দ্বীনি কর্তব্য পরিত্যাগ করার কারণে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন। মনে রেখো, পাথর মেরে হত্যার বিধান আল্লাহর কিতাবে সত্য এবং বিবাহিত পুরুষ ও নারীর প্রতি প্রযোজ্য, যদি যেনার শরীয়ত সম্মত সাক্ষ্য-প্রমান উপস্থিত হয় অথবা গর্ভ ও স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়। (ছহীহ মুসলিম ২য় খণ্ড, পৃ: ৬৫; তাফসিরে মা'রিফুল কুরআন, পৃ: ৯২৬)

উবাদা ইবনু সামিত (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, আমার কাছ থেকে তোমরা (আল্লাহর বিধান) নিয়ে যাও। তোমরা আমার কাছ থেকে নিয়ে যাও, তোমরা আমার কাছ থেকে নিয়ে যাও। (৩ বার বলেছেন) আল্লাহ তাদের অর্থাৎ যেনা কারীদের জন্য সুস্পষ্ট বিধান দিয়ে দিয়েছেন। তা এই যে, অবিবাহিত পুরুষ ও অবিবাহিত নারীর যেনার শাস্তি হলো, একশত দোররা এবং এক বছরের জন্য দেশান্তর করা। আর বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিত নারীর যেনার শাস্তি হলো প্রথমে একশত দোররা ও পরে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা। (ছহীহ মুসলিম ৪৫০৯; মহিলা বিষয়ক হাদিছ সংকলন -পিস পাবলিকেশন, হা: ৪৫৩)

বি: দ্র: বিবাহিত পুরুষ ও নারীদের রজম করে হত্যার পূর্বে একশত বেতের আঘাত করা রহিত হয়েছে।

এক কথায় কুফফাররা বলছে, মানুষের তৈরি আইন দিয়ে বিচার কর। আর চোরের হাত কাটা ও যেনাকারের পাথর মেরে হত্যা করার বিধান বাতিল কর। আর মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলছেন, মানুষের তৈরি বিধান বাতিল কর। আর

চোর চুরি করলে হাত কাটো এবং যেনাকারকে পাথর মেরে হত্যা কর। তাছাড়াও আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, জেনে রাখো, সৃষ্টি যার বিধান চলবে তারই। (সূরা আরাফ, আয়াতঃ ৫৪) এখন সেই গণতান্ত্রিক মাধ্যমে হওয়া ইসলামী সরকার কার কথা রাখবে? অবশ্যই সে গণতান্ত্রিক দেশের অধিকাংশ জনগণের কথা রাখতেই বাধ্য। কারণ গণতন্ত্রে সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ। আর আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, যারা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না তারাই কাফির। (সূরা মায়িদা, আয়াতঃ ৪৪)

যারা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী বিচার করে না তারাই জালিম। (সূরা মায়িদা, আয়াতঃ ৪৫)

যারা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী বিচার করে না তারাই ফাসেক। (সূরা মায়িদা, আয়াতঃ ৪৭)

সুতরাং, যদি কেহ গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তাদের অবস্থা ঠিক তেমনই- যেমন কেহ শুকরের হারাম গোস্তের সাথে কুরবানির গরু-ছাগলের হালাল গোস্ত একত্রিত করে ভক্ষণ করতে চায়। যদি কেহ বলেন, গণতন্ত্রের সাথে মিশে ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এটা আমাদের কৌশল আর অন্তরের বিষয় তো আল্লাহ দেখছেন। কারণ নিয়তের উপর মানুষের কর্মের ফায়সালা হয়। এই চিন্তা যারা করেন তবে তাদের এটা জানা জরুরী যে, যেই কৌশল করলে আল্লাহর স্পষ্ট বিধান বাতিল করে, শয়তানের তৈরি বিধানে জীবন পরিচালনা করতে হবে। সেই কৌশল ইসলামে বৈধ নেই।

ইমাম গাজ্জালী (রহি:) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এর এই বাণী, "প্রত্যেক আমলই তার নিয়তের উপর নির্ভরশীল" তিনটি জিনিসের অর্থাৎ ইবাদাত, সুবাহ ও গুনাহ এর মধ্যে শুধু মাত্র আনুগত্য ও সুবাহ অর্থাৎ শরীয়তে অনুমতিপ্রাপ্ত আমল এর মধ্যে সীমিত। গুনাহের জন্য নয়। এটা এই কারণে যে, আনুগত্য গুনাহ-তে পরিণত হয় (খারাপ) নিয়তের দ্বারা। বিপরীত দিকে, একটি খারাপ কাজকে কখনোই নিয়তের দ্বারা আনুগত্যে পরিনত করা যায় না। (ইহইয়াউল উলুম, পৃ: ৩৯১)

অতএব যেই কৌশলটি সুস্পষ্ট গুনাহ। শুধু গুনাহ নয় কাবিরহ গুনাহ। সেই কৌশল করে কাবিরহ গুনাহের মধ্যে লিপ্ত হয়ে নিয়তের উপর কাজের নির্ভরশীল এই চিন্তাই থাকলে হবে না। গুনাহকে বর্জন করে শরিয়াত সম্মত আমলের ক্ষেত্রে সেই চিন্তা করতে হবে। তাদের মনে রাখা জরুরী যে অসৎ ব্যাক্তি যাদের অন্তরে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন, তাদের সাথে মিশে কৌশল অবলম্বন করে ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠা করা তো দূরের কথা, নিজেদের ঈমানটুকুও টিকিয়ে রাখতে পারবেন কিনা? সেই চিন্তাটা করাই অতীব জরুরী। কেননা, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, অসৎ বন্ধু কামারের ন্যায়। সে হয়তো তোমার জামা পুড়িয়ে ফেলবে, তা না হলে কমপক্ষে তুমি তার কাছ থেকে দুর্গন্ধ পাবে। (ছহীহুল বুখারী, অধ্যায়ঃ ক্রয়-বিক্রয়, হা: ২১০১)

কাজেই শয়তানের অনুসারীদের সঙ্গে মিলে ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠিত করার চিন্তা অনর্থক চিন্তা আর সাধারণ মুসলমানকে ধোকা দেওয়া ছাড়া কিছুই না। সুতরাং মহান আল্লাহ তা'য়ালা যেইভাবে ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠা করার শিক্ষা দিয়েছেন ঠিক সেইভাবেই ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা করতে হবে। আল্লাহর বিধান বাতিলকারী কাফিরদের সাথে যুক্ত হয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। কারণ, কাফিররা তাগুতের সৈনিক আর ইসলামপন্থীরা আল্লাহর সৈনিক। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, যারা ঈমান আনে আল্লাহ তাহাদের অভিভাবক, তিনি তাহাদেরকে অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া আলোতে লইয়া যান। আর যাহারা কুফুরি করে তাগুত তাহাদের অভিভাবক, ইহারা তাহাদেরকে আলো হইতে অন্ধকারে লইয়া যায়। উহারাই অগ্নির-অধিবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে। (সূরা বাকারাহ, আয়াতঃ ২৫৭)

এছাড়া মহান আল্লাহ তা'য়ালা প্রতিটা নাবী-রসূল গণকে পাঠিয়েছেন তাগুতকে বর্জন করার জন্য। সুতরাং যারা আল্লাহর জমিনে ইসলামের বিধান কায়েম করতে চাইবে তাদের সর্ব প্রথম কাজটিই হলো তাগুতকে বর্জন করা। তাগুতের সঙ্গে থেকে সে কখনোই আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আল্লাহর ইবাদাত করিবার ও তাগুতকে বর্জন করিবার নির্দেশ দিবার

জন্যেই আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রসূল পাঠাইয়াছি। (সূরা নাহল, আয়াতঃ ৩৬)

অতএব, সকল পদ্ধতি বর্জন করে একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়া পদ্ধতি অনুযায়ীই আল্লাহর জমিনে আল্লাহ দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ যেভাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার আদেশ দিয়েছেন ঠিক সেইভাবেই করতে হবে। নিজেদের মনমত সুবিধা খুজে তাগুতি শক্তির হাত থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ﷺ এর আদেশ থেকে মুখ ফিরানো যাবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, হে মু'মিনগণ! আল্লাহ ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য কর এবং তোমরা তাহার কথা শ্রবণ করিতেছ, তখন উহা হইতে মুখ ফিরাইও না। (সূরা আনফাল, আয়াতঃ ২০)

সুতরাং যারা আল্লাহ ও তার রসূলের ﷺ এর দেয়া পদ্ধতি বা আদেশ থেকে মুখ ফিরাবে এবং কাফির মুশরিকদের ভয়ে কাফির মুশরিকদের বিধান-পদ্ধতি গ্রহণ করবে শয়তান তাদেরকেও জাহান্নামের দিকে আহবান করবে এবং শয়তান তার কুকৌশলে তাদেরকে জাহান্নামের পথে নিয়েও যাবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, শয়তান তোমাদের শত্রু; অতএব তাকে শত্রু রূপেই গ্রহণ কর। সে তার দলবলকে আহবান করে যেন তারা জাহান্নামী হয়। যারা কুফুরি করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর আযাব। (সূরা ফাতির, আয়াতঃ ৬)

যারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে, তারা মুলত শয়তানের কুকর্ম ও শয়তানের নেতৃত্ব আল্লাহর জমিনে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে। অনুরূপভাবে যারা আল্লাহর ও তাঁর রসূলের ﷺ শিখানো পদ্ধতি ব্যতিরেকে গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে, তারাও মূলত তাদের অজান্তেই শয়তানের কুকর্ম ও শয়তানের রাজত্ব আল্লাহর জমিনে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা করছেন। কাজেই অহংকারবশত ও দীর্ঘদিন গণতন্ত্রে থেকেও হকের উপর থাকার দাবীর কারণে গণতন্ত্র বিরোধী কথায় বিদ্বেষ পোষন করে। পূনরায় গণতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত না থেকে মহান আল্লাহ তা'য়ালার নিকট তাওবা করে ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার নতুন উদ্দীপনা নিয়ে আবার মাঠে নামুন। ইনশাআল্লাহ বিজয় মুসলমানদের হবেই। আমার উল্লেখিত আলোচনাগুলো গণতন্ত্র সমর্থনকারী কোন ইসলামী সংগঠন

নিজেদের বিরুদ্ধে টেনে নিয়ে আমার প্রতি বিদ্বেষ ছড়াবেন না। একটি বার ভেবে দেখুন, গণতন্ত্র যদি হারাম হয়, আর তা গ্রহণ করা যদি কুফুরি হয় তবে আপনারা অবশ্যই জাহান্নামের আগুনে পা রেখেছেন। সেখান থেকে ফিরে আসা মানে অনন্তকালের জান্নাত লাভের উপায়। কারণ আপনারা যেই শ্রম ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন তা কেবল জান্নাত লাভের আশাতেই। আর আপনাদের চিন্তায় গণতন্ত্র যদি হারাম না হয় তবে তা বর্জন করার দরুন পরকালের কোন ক্ষতি আপনাদের হবে না। এমনকি বড় ধরনের ইহকালীন কোন ক্ষতিও আপনাদের হবে না।

অনুরূপভাবে আছাবিয়াত অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী থেকেও বিরত থাকতে হবে। কারণ ইসলামে জাতীয়তাবাদীর কোন স্থান নেই। কেননা, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই। এক মুসলমান যেন অন্য মুসলমানের উপর জুলুম না করে এবং তাকে শত্রুর হাতে তুলে না দেয়। যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করবে, আল্লাহ তা'য়ালা তার প্রয়োজন পূরণ করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দুঃখ-দুশ্চিন্তা দূর করবে, আল্লাহ তা'য়ালা কিয়ামাত দিবসে সেই ব্যাক্তির দুঃখসমূহের মধ্যে একটি দুঃখ দূর করবেন। যে ব্যাক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন করবে। আল্লাহ তা'য়ালা পরকালে তার দোষ গোপন রাখবেন। (আর-রহীকুল মাখতুম, পৃ: ১৮৬; ছহীহ বুখারী, পৃ: ৪২২; ছহীহ মুসলিম, পৃ: ৪২২)

অতএব, বাংলাদেশে যে সকল মুসলমান আছেন তারা যেমন আমাদের ভাই তেমনি আরাকান, কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, আফগানিস্থান, চীন, ভারত, ইত্যাদী বিশ্বের যে কোন স্থানেই একজন মাত্র মুসলিম থাকলেও তারা আমাদের ভাই। কাজেই তাদেরকে কোন জালিমের হাতে নির্যাতিত হতে দেখে চুপ করে বসে থাকা যাবে না। সকল মুসলমানদের দুঃখ-কষ্টেই নিজের অন্তরেও দুঃখ কষ্টে ব্যাথিত হতে হবে। মুসলমান কোন দেশের সীমান্ত বা কোন জাতীয়তাবাদীর মধ্য সীমাবদ্ধ নয়।

আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যাক্তি লক্ষ্যহীন নেতৃত্বের অর্থাৎ যেই নেতৃত্বের সঠিক কোন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নেই বা যেই নেতৃত্বের সঠিক কোন নেতাই নেই এমন নেতৃত্বের পতাকাতলে যুদ্ধ করে জাতীয়তাবাদীর টানে ক্রুদ্ধ হয়

এবং জাতীয়তাবাদীর জন্যেই যুদ্ধ করে সে আমার উম্মাত নয়। (ছহীহ মুসলিম, হা ৪৬৩৫)

অর্থাৎ যারা জাতীয়তাবাদীর টানে ক্রুদ্ধ হয় আর জাতীয়তাবাদীর জন্যেই যুদ্ধ করে তারা আল্লাহর রসূল ﷺ এর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। এই অবস্থায় যদি তার মৃত্যু হয় অবশ্যই সেই মৃত্যু জাহিলীয়াতের মৃত্যু হবে যার পরিণাম খুবই ভয়াবহ।

হযরত জুনদুব ইবনু আব্দুল্লাহ বাজালী (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যাক্তি লক্ষ্যহীন নেতৃত্বের পতাকাতলে যুদ্ধ করে, জাতীয়তাবাদীর দিকে মানুষকে আহব্বান করে এবং জাতীয়তাবাদীর কারণেই সাহায্য করে, তার মৃত্যু জাহিলীয়াতের মৃত্যু। (ছহীহ মুসলিম, হা: ৪৬৩৯)

উক্ত হাদিছে জাতীয়তাবাদীর দিকে আহবানকারী এবং জাতীয়তাবাদীর কারণেই সাহায্যকারী এর মধ্যে জাতীয়তাবাদীর আহ্বানে সাড়াদানকারীও অন্তর্ভুক্ত। তাদের যদি মৃত্যু হয়, সেই মৃত্যুও হবে জাহিলীয়াতের মৃত্যু।

ইমাম গাজ্জালী (রহি:) বলেন, মানব রচিত দলগুলিও আছাবিয়াত অর্থাৎ জাতীয়তাবাদীর অন্তর্ভুক্ত। যদি না তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পৃথিবীর মুসলমানদের সাহায্যের জন্য কাজ করে অর্থাৎ নিজ ভূখণ্ড বা নিজ গোত্রের মধ্যেই ইসলামী বিধান কায়েমের চেষ্টা সীমাবদ্ধ না রাখে। (ইহইয়াউল উলুম, পৃ: ২০৭)

সুতরাং, যে বা যারা শুধু নিজ গোত্র বা নিজ ভূখণ্ডেই কোন দলকে সীমাবদ্ধ রাখে বা এরূপ চিন্তা করে আমার জীবনের সমগ্র সাধন এই দেশ ও জাতির কল্যানের জন্যই অথবা যদি কেউ মুসলিম হওয়া শর্তেও নিজ গোত্র বা জাতির পরিচয়েই পরিচিত হতে চায়। যেমন- কেহ বলে ‘আমি বাঙ্গালী’ -এ সমস্ত কথা বা কাজ সবই জাতীয়তাবাদীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এক দেশের মুসলিম বা এক গোত্রের মুসলিম অন্য কোন দেশ বা গোত্রের নিকটে গিয়ে তার দেশ বা গোত্রের পরিচয়ে পরিচিত হতে পারবে। যেমন যদি কেহ বলে আমি বাংলাদেশী কিংবা পাকিস্থানী। অথবা গোত্রের পরিচয় দিয়ে বলে আমি মোল্লাহ, মুন্সি, খান কিংবা কাহতানী, পাঠানী, মাখযুমী ইত্যাদি। এগুলো জাতীয়তাবাদীর অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে যদি কেউ নিজ

দেশ বা গোত্রের লোক অপরাধী জানতে পাওয়ার পরেও সেই অপরাধের জের ধরেই নিজ দেশ বা গোত্রের পক্ষ নিয়ে অন্যদের সাথে মীমাংসা না করে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ে, তবে সেটাও জাতীয়তাবাদীর অন্তর্ভুক্ত।

হযরত ফুসাইলা (রহি:) বলেন, আমি আমার পিতাকে এই বলতে শুনিয়াছি যে, তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপন কওমকে মহব্বত করাও কী আছাবিয়াত অর্থ্যৎ জাতীয়তাবাদীর অন্তর্ভুক্ত? আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, আপন কওমকে মহব্বত করা আছারিয়াত নয় বরং আছারিয়াত এই যে, কওমের অন্যায়ের উপর থাকা সত্বেও মানুষ নিজের কওমকে সাহায্য করে। (মুসনাদে আহমাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১০৮)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে সকল প্রকার তাগুতি বর্জন করে মহান আল্লাহর মনোনীত দ্বীন ইসলামের প্রতি অটুট থাকার তাওফিক ও ধৈর্যদান করুন। আমিন।

একমাত্র মহান আল্লাহ তা'য়ালাই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক

১। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আসমান ও জমিনের সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরা আল-ইমরান, আয়াতঃ ১৮৯)

২। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আসমান ও জমিনে যাহা কিছু আছে সব আল্লাহরই এবং সবকিছুকে আল্লাহ পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। (সূরা নিসা, আয়াতঃ ১২৬)

৩। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আসমান ও জমিনের এবং ইহাদের মধ্য যাহা কিছু আছে তাহার সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরা মায়িদা, আয়াতঃ ১৭)

৪। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, তুমি কি জান না, আসমান ও জমিনের সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। যাহাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেন আর যাহাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। (সূরা মায়িদা, আয়াতঃ ৪০)

কেন সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ?

১। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আল্লাহই শস্য-বীজ ও আঁটি অংকুরিত করেন, তিনিই প্রাণহীন হইতে জীবন্তকে বাহির করেন এবং জীবন্ত হইতে প্রাণহীনকে বাহির করেন। তিনিই তো আল্লাহ সুতরাং তোমরা কোথায় ফিরিয়া যাইবে? তিনিই উষার উন্মেষ ঘটান, তিনিই বিশ্রামের জন্য রাত্রি এবং গণনার জন্য সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছেন, এ সবই পরাক্রমশালী সর্বাঙ্গের নিরুপণ। তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তদ্বারা স্থলের ও সমুদ্রের অন্ধকারে তোমরা পথ পাও। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমি তো নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃতি করিয়াছি। তিনিই তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদের জন্য দীর্ঘ ও স্বল্পকালীন বাসস্থান রহিয়াছে। অনুধাবনকারী সম্প্রদায়ের জন্য আমি তো নিদর্শন সমূহ বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছি। তিনিই আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর উহা দ্বারা আমি সর্বপ্রকার উদ্ভিদের চারা উদগম করি; অনন্তর উহা হইতে সবুজ পাতা উদ্‌গত করি, পরে উহা হইতে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা উৎপাদন করি এবং খেজুর বৃক্ষের মাথি হইতে ঝুলন্ত কাঁদি বাহির করি, আর আঙ্গুরের উদ্যান সৃষ্টি করি এবং যায়তূন ও দাড়িম্বও (ডালিম)। ইহারা একে অন্যের সদৃশ এবং বিসদৃশ। লক্ষ্য করো উহার ফলের প্রতি, যখন উহা ফলবান হয় এবং উহার পরিপক্কতা প্রাপ্তির প্রতি। মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য উহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে। (সূরা আনআম, আয়াতঃ ৯৫-৯৯)

২। তিনিই লতা ও বৃক্ষ-উদ্যান সমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং খেজুর বৃক্ষ, বিভিন্ন স্বাদ-বিশিষ্ট খাদ্যশস্য, যায়তূন ও দাড়িম্বও (ডালিম) সৃষ্টি করিয়াছেন। এগুলি একে অন্যের সদৃশ এবং বিসদৃশও। যখন উহা ফলবান হয় তখন উহার ফল আহার করিবে আর ফসল তুলিবার দিনে উহার হক প্রদান করিবে এবং অপচয় করিবে না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের ভালোবাসেন না। (সূরা আন'আম, আয়াতঃ ১৪১)

৩। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, তিনিই আল্লাহ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। যিনি আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করিয়া তদ্দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফল মূল উৎপাদন করেন। যিনি নৌযানকে তোমাদের অধীন করিয়া দিয়াছেন

যাহাতে তাহার বিধানে উহা সমুদ্রে বিচরণ করে এবং যিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন নদীসমূহকে। তিনিই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন সূর্য ও চন্দ্রকে, যাহারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদের কল্যানে রাত্রি ও দিবসকে। এবং তিনি তোমাদেরকে দিয়াছেন তোমরা তাঁহার নিকট যাহা কিছু চাহিয়াছ তাহা হইতে অর্থাৎ মানুষের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তিনি তাহাই দিয়াছেন। তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করিলে উহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারিবে না। মানুষ অবশ্যই অতিমাত্রায় জালিম, অকৃতজ্ঞ। (সূরা ইব্রাহীম, আয়াতঃ ৩২-৩৪)

৪। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, তিনিই আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন। উহাতে তোমাদের জন্য রহিয়াছে পানীয় এবং উহা হইতে জন্মায় উদ্ভিদ যাহাতে তোমরা পশুচারণ করিয়া থাক। তিনি তোমাদের জন্য উহার দ্বারা জন্মান শস্য, যায়তূন, খেজুর বৃক্ষ, দ্রাক্ষা (আঙ্গুর) এবং সর্ব প্রকার ফল। অবশ্যই ইহাতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রহিয়াছে নিদর্শন। তিনিই তোমাদের কল্যানে নিয়োজিত করিয়াছেন রজনী, দিবস, সূর্য এবং চন্দ্রকে; আর নক্ষত্ররাজিও অধিন হইয়াছে তাঁহারই নির্দেশে। অবশ্যই ইহাতে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রহিয়াছে নিশ্চিত নিদর্শন। এবং তিনি বিবিধ প্রকার বস্তুও যাহা তোমাদের জন্য পৃথিবীতে সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাতে রহিয়াছে নিশ্চিত নিদর্শন সেই সম্প্রদায়ের জন্য যাহারা উপদেশ গ্রহণ করে। তিনি সমুদ্রকে অধীন করিয়াছেন, যাহাতে তোমরা উহা হইতে তাজা মৎস আহার করিতে পার এবং যাহাতে উহা হইতে আহরণ করিতে পার রত্নাবলী, যাহা তোমরা ভূষণ রূপে পরিধান কর; এবং তোমরা দেখিতে পাও, উহার বুক চিরিয়া নৌযান চলাচল করে এবং উহা এই জন্য যে, তোমরা যেন তাঁহার অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার এবং তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। এবং তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করিয়াছেন, যাহাতে পৃথিবী তোমাদেরকে লইয়া আন্দোলিত না হয় এবং স্থাপন করিয়াছেন নদ-নদী ও পথ, যাহাতে তোমরা তোমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পার। এবং পথনির্নায়ক চিহ্ন সমূহও। আর উহারা নক্ষত্রের সাহায্যেও পথের নির্দেশ পায়। (সূরা নাহল, আয়াতঃ ১০-১৬)

৫। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহরই; তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। আল্লাহ ব্যতিত তোমাদের কোন অভিভাবক নাই, সাহায্যকারীও নাই। (সূরা তাওবা, আয়াতঃ ১১৬)

৬। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, বল, কে তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী হইতে জীবনোপকরণ সরবরাহ করে অথবা শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি কাহার কর্তৃত্বাধীন? জীবিতকে মৃত হইতে কে বাহির করে এবং মৃতকে জীবিত হইতে কে বাহির করে এবং সকল বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করে? তখন তারা বলিবে আল্লাহ। বল, তবুও কি তোমরা সাবধান হইবে না। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের সত্য প্রতিপালক। সত্য ত্যাগ করিবার পর বিভ্রান্ত ব্যতীত আর কি থাকে? সুতরাং তোমরা কোথায় চালিত হইতেছ? (সূরা ইউনুস, আয়াতঃ ৩১-৩২)

দুনিয়ার মানুষের হাতে অস্থায়ীত্ব ক্ষমতা দেবার মালিকও আল্লাহ

১। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, বল, হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ। তুমি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর এবং যাহার নিকট হইতে ইচ্ছা তুমি ক্ষমতা কাড়িয়া লও; যাহাকে ইচ্ছা ইজ্জত দান কর, আর যাহাকে ইচ্ছা তুমি হীন কর। কল্যাণও তোমার হাতেই। নিশ্চয়ই তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। তুমি রাত্রিকে দিবসে পরিণত এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিণত কর; তুমিই মৃত হইতে জীবন্তদের আভির্ভাব ঘটাও, আবার জীবিত হইতে মৃতের আবির্ভাব ঘটাও। তুমি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযিক দান কর। (সূরা আল-ইমরান, আয়াতঃ ২৬-২৭)

উপরক্ত আয়াতটি থেকে বুঝা যায় সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক একমাত্র মহান আল্লাহ তা'য়ালা। তিনি এই দুনিয়ার মানুষকে পরীক্ষা করার ইচ্ছায় কিছু সময়ের জন্য দুনিয়ার বিভিন্ন ভূখণ্ডে বিভিন্ন মানুষের হাতে ক্ষণিকের জন্য রাজ ক্ষমতা তুলে দেন। সে ভালো হোক অথবা খারাপ হোক। জালিমদের হাতে দুনিয়ার কোন ভূখণ্ডের ক্ষমতা থাকলে, এটা ভাবার কোনই কারণ নেই যে, যেহেতু ''আল্লাহই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক''। আর আল্লাহ যখন তাকে ক্ষমতা দিয়েছেন। সেহেতু সে আল্লাহ তা'য়ালার একজন পছন্দের ব্যক্তি। কারণ আল্লাহ তা'য়ালা জালিমদেরকে রাজত্ব ও ধনভাণ্ডার দিয়ে পরীক্ষা করেন যে তারা আল্লাহ মুখী

হয়? না কি তারা অহংকারী হয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, কারূন ছিলো মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত কিন্তু সে তাদের প্রতি অহংকার প্রকাশ করিয়াছিল। আমি তাহাকে দান করিয়াছিলাম এমন ধনভাণ্ডার যাহার চাবিগুলি বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। স্মরণ কর, তাহার সম্প্রদায় তাকে বলে ছিলো, দম্ভ করিও না, নিশ্চয় আল্লাহ দম্ভকারীদেরকে ভালোবাসেন না। আল্লাহ যাহা তোমাকে দিয়াছেন তদ্দারা আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান কর এবং দুনিয়া হইতে তোমার অংশ ভুলিও না। (অর্থাৎ বৈধভাবে অর্জন কর ও ব্যয় কর এবং আখিরাতের জন্য পূন্য সঞ্চয় কর) তুমি অনুগ্রহ কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে চাহিও না। আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টি কারীদেরকে ভালোবাসেন না।

সে বলিল, এই সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে প্রাপ্ত হইয়াছি। সে কি জানিত না আল্লাহ তাহার পূর্বে ধ্বংস করিয়াছেন বহু মানবগোষ্ঠীকে যাহারা তাহার অপেক্ষা শক্তিতে ছিল প্রবল, জনসংখ্যায় ছিল অধিক? অপরাধীদেরকে উহাদের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে। কারূন তার সম্প্রদায়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল জাকজমক সহকারে যাহারা পার্থিব জীবন কামনা করিত তাহারা বলিল, আহা কারূনকে যেইরূপ দেওয়া হইয়াছে আমাদেরকেও যদি তাহা দেওয়া হইত! প্রকৃতই সে মহাভাগ্যবান। এবং যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছিল তাহারা বলিল, ধিক তোমাদেরকে! যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদের জন্য আল্লাহর পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ এবং ধৈর্যশীল ব্যতিত ইহা কেহ পাইবে না।

অতঃপর আমি কারূনকে তাহার প্রাসাদসহ ভূগর্ভে প্রোথিত করিলাম। তাহার স্বপক্ষে এমন কোন দল ছিল না যে আল্লাহর শাস্তি হইতে তাহাকে সাহায্য করিতে পারিত এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না। পূর্বদিন যাহারা তাহার মত হইবার কামনা করিয়াছিল, তাহারা বলিতে লাগিল, দেখিলে তো, আল্লাহ তাঁহার বান্দাদের মধ্যে যাহার জন্য ইচ্ছা তাহার রিযিক বর্ধিত করেন এবং যাহার জন্য ইচ্ছা হ্রাস করেন। যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি সদয় না হইতেন তবে আমাদেরকেও তিনি ভূগর্ভে প্রোথিত করিতেন। দেখলে তো! কাফিররা সফলকাম হয় না। (সূরা কাসাস, আয়াতঃ ৭৬-৮২)

অতএব, জমিন আল্লাহর। ক্ষমতাও আল্লাহ তা'য়ালার। আল্লাহ তা'য়ালা যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দিবেন এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা ছিনিয়ে নিবেন। একটি বিষয় স্থিরভাবে ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন।

এই তো আজ থেকে ৬০/৭০ বছর পূর্বেও এই দেশ অন্যরা শাসন করতো। তাদের হাত থেকে অন্যজন নিয়ে রাজত্ব করেছে আর সেও রাজত্ব হারিয়ে ফেলেছে আবার অন্য জনের হাতে চলে গেছিলো ক্ষমতা এভাবেই দুনিয়ার অস্থায়ী ক্ষমতায় একজন আসে, আর একজন যায়। এমনভাবেই চলতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। হয়তো এমনও অনেক বাস্তব ঘটনা ঘটেছে যে, আমার বা আপনাদের মধ্যেই কারো দাদা বা তার বাবা কিংবা দাদা ছিলো অনেক সম্পত্তির মালিক। কিন্তু তাদের মৃত্যুর পর এইতো দুই-এক পুরুষ পরেই কালের বিবর্তনে সেই সম্পত্তির মালিক এখন আপনি। মাত্র কিছু দিন পূর্বেও সেই সম্পত্তির প্রতিই কর্তৃত্ব খাটিয়েছে আপনারই দাদা কিংবা দাদার বাবা। আজকে কিন্তু তিনি আর নাই। শুধু গল্পেই পরিণত হয়েছে। একদিন আপনিও থাকবেন না, আপনার এই সম্পত্তির মালিক হয়ে যাবে অন্য কেউ। কাজেই চিরস্থায়ী মালিককে সন্তুষ্ট অর্জন করাই এই ক্ষণস্থায়ী মালিকদের কাজ। কিন্তু মানুষ ক্ষণিকের মালিক হয়ে মানুষদের প্রতি জুলুম করে জালিমে পরিণত হচ্ছে। আর না হয়, মানুষের প্রতি ইহসান করে মানুষকে ভালোবেসে আল্লাহর সন্তুষ্ট অর্জনে সৎ শাসক হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছে।

আর স্থায়ী মালিক মহান আল্লাহ তা'য়ালা ঠিকই চিরস্থায়ী ক্ষমতায় স্থির রয়েছে। আল্লাহু আকবার। তিনিই পরাক্রমশালী আল্লাহ। তিনিই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। আর তিনিই সর্বশক্তিমান।

তৃতীয় অংশ

وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

আল্লাহ সর্বশক্তিমান

আর তিনি সকল কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। আলোচ্য আয়াত সূরা মূলকের প্রথম আয়াতের শেষ অংশে মহান আল্লাহ তা'য়ালার তাঁর বিশেষ গুনবাচক একটি নাম উল্লেখ করেন। আর তা হলো ক্বদী-রুন যার অর্থ সর্বশক্তিমান। সূরা মুলকের প্রথম আয়াতটি নিয়ে যত আলোচনা করেছি এমন আরো কয়েক গুন যদি করা হয় তবুও আলোচ্য আয়াতের গভীরতা প্রকাশ করে শেষ করা যাবে না, তবুও যেই আলোচনা আমি পুস্তকটিতে করলাম তারই পূর্ণতা লাভ হলো মহান আল্লাহ তা'য়ালার এই গুনবাচক নামটি দিয়ে। আলোচ্য আয়াতটি প্রথমাংশে মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর অধিক মর্যাদা ও ক্ষমতারাজি আলোচনা দিয়ে শুরু করেছেন। তিনি বলেন "তাবারকা" -সর্বোচ্চ সুমহান। আয়াতটির মধ্যমাংশে তাঁর ক্ষমতার কিছুমাত্র বহিঃপ্রকাশ ঘটান। তিনি বলেন, "আল্লাজি বিয়াদিহিল মুলক" -যার হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা। অতঃপর আয়াতটির শেষাংশের তাঁর শক্তি ও ক্ষমতার পূর্ণ প্রকাশ ঘটান। যেমন আমরা ছোট বেলায় খেলার সময় সহপাঠীদের সাথে বির্তকের এক পর্যায়ে বলতাম, অমুকের চেয়ে আমি এই খেলাটা ১০০ ভাগ বেশি জানি, অপর কেই বলে উঠত, আমি ১০০০ ভাগ বেশি জানি, এমনভাবেই ক্রমান্বয়ে জানার সংখ্যার ভাগটি বেশি হতো। হঠাৎ কেও বুদ্ধি খাটিয়ে বলে ফেলত, তোমরা এই খেলা সম্পর্কে যতভাগ জানো, আমি সব সময় তোমাদের এই সংখ্যা থেকে ১০০ ভাগ বেশি জানি। এখন চিন্তা করে দেখুন কেহ যদি বিজয়ই হবার জন্য রাগবশত বলে, আমি এক কোটি ভাগ বেশি জানি। তবুও পূর্বের জন ১ কোটি ভাগ বেশি জানারও উপরে থাকবে, কারণ পূর্বের জন এর চেয়ে ১০০ ভাগ বেশি জানবে। আমি উক্ত উদাহরণটি দিলাম শুধু বুঝানোর জন্য যে, উক্ত আয়াতের মধ্যমাংশে তাঁর ক্ষমতার কিছুমাত্র বহিঃপ্রকাশ ঘটানো ও শেষাংশ দ্বারা তাঁর শক্তি ও ক্ষমতার পূর্ণ প্রকাশ ঘটিয়েছেন। অর্থাৎ সকল কিছুর উপরে তিনি সর্বশক্তিমান। আল্লাহু আকবার!

বর্তমান সময়ে কিছু বক্তার আলোচনা শোনা যায়, যারা বলেন, ‘‘আল্লাহকে সর্বশক্তিমান’’ বলা যাবে না। আল্লাহকে সর্বশক্তিমান বলা শিরক। (নাউযুবিল্লাহ) এবং এটা বলা শিরক হবার পেছনে তারা অনেক দলীল ও যুক্তি প্রমানও দেখায়। মুলত এই সকল আলোচনাতে মুসলিম উম্মাহর ক্ষতি ছাড়া কোন উপকার আছে বলে আমার মনে হয় না। তারা নিত্য নতুন চমক লাগানো কথার আলোচনা তুলে মানুষকে চমকে দিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করতে চায়। অথচ তাদের জন্য উচিৎ ছিল, নিত্য নতুন চমক লাগানো কথা না বলে, কিভাবে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ঐক্য করা যায় এবং কিভাবে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান কায়েম করা যায় সেই বিষয়ে আলোচনা করা।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, যে ব্যাক্তি এজন্য ইলম অর্জন করে যে, তার দ্বারা আলেমদের সাথে বিতর্ক করবে বা তা দ্বারা অজ্ঞদের সাথে ঝগড়া করবে কিংবা মানুষকে নিজের প্রতি আকর্ষণ করবে, আল্লাহ তা’য়ালা তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবেন। (মিনহাজুল আবেদীন -ইমাম গাজ্জালী (রহি:), পৃ: ১৪)
এছাড়াও ইমাম গাজ্জালী (রহি:) বলেন, আবু ইয়াজিদ বোস্তামী (রহি:) বলেছেন, আমি দীর্ঘ ৩০ বছর মোজাহেদায় কৌশেশ করেছি। এর মধ্যে ইলেমের বিপদের চাইতে অধিক কোন কঠিন বিষয় পাই নাই। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃ: ১৪) সুতরাং, উক্ত আলেমদের জ্ঞানার্জন আর তা প্রচার করার ক্ষেত্রে খুবই সতর্ক হওয়া জরুরী।

মহান আল্লাহ তা’য়ালা তাদেরকে ক্ষমা করুন ও ইসলামের মৌলিক বিষয়ে আলোচনা করা তাওফিক দান করুন। আমিন।

১। আল্লাহ তা’য়ালা বলেন, সর্বোচ্চ সুমহান তিনি, যার হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা, তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরা মুলক, আয়াতঃ ১)

২। আল্লাহ তা’য়ালা বলেন হে মু’মিন গণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবা কর- বিশুদ্ধ তাওবা; তাহা হইলে তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কর্মগুলি মোচন করিয়া দিবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেইদিন আল্লাহ লজ্জা দিবেন না নাবীকে এবং তাহার মু’মিন

সঙ্গীদেরকে, তাদের নূর তাদের সম্মুখে ও দক্ষিণ পার্শে জীবিত হইবে। তাহারা বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের নূরকে পূর্ণতা দান কর এবং আমাদেরকে ক্ষমা কর, নিশ্চয়ই তুমি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরা তাহরীম, আয়াতঃ ৮)

৩। আল্লাহ তা’য়ালা বলেন, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করে, আধিপত্য তাঁহারই এবং প্রশংসা তাঁহারই, তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরা তাগাবুন, আয়াতঃ ১)

মহান আল্লাহ তা’য়ালা আমাদের সকলকেই উক্ত পুস্তকটির সকল আলোচনা বুঝে আমল করার তাওফিক দান করুন এবং সকল প্রকার তাগুত বর্জন করে আল্লাহর তাওহিদের উপর সুদৃঢ় থাকার তাওফিক দান করুন। আমিন।

“সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ”

(সমাপ্ত)

দোয়াঃ সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আংতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আ’তু-বু ইলাইহ।

গ্রন্থসূচিঃ

১। কুরআনুল কারীম -ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
২। কুরআনুল মাজীদ -আল কুরআন একাডেমী লন্ডন।
৩। কুরআন মাজিদের বিষয় ভিত্তিক আয়াত -ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
৪। আল কুরআনের বিষয় ভিত্তিক আয়াত -মিনা বুক হাউস।
৫। তাফসিরে আনোয়ারুল কুরআন।
৬। তাফসিরে মা'রিফুল কুরআন -মুফতী মুহাম্মাদ শাফী (রহি:), ইসঃ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
৭। ছহীহুল বুখারী -ইমাম বুখারী (রহি:), তাওহিদ পাবলিকেশন্স।
৮। ছহীহুল মুসলিম -ইমাম মুসলিম (রহি:), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
৯। আবু দাউদ -ইমাম আবু দাউদ (রহি:), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
১০। সুবুলুস সালাম।
১১। মুজামুল কাবীর -ইমাম তাবারানী।
১২। তাফসিরে জালালাইন।
১৩। আর্-রাহীকুল মাখতূম -মাওলানা শফিউর রহমান মোবারকপুরী।
১৪। আত-ত্বরিক ইলা ইকামাতিদ দ্বীন -শাইখ রহমানী।
১৫। ড. হামিদ মিতওয়ালী'স রুলিং সিস্টেম ইন ডেভেলপিং কান্ট্রি।
১৬। দ্যা ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনশিপ।
১৭। বাংলাদেশ সংবিধান।
১৮। ইহইয়াউল উলুম -ইমাম গাজ্জালী (রহি:)।
১৯। ফাতহুল গয়ব -শাইখ আব্দুল কাদির জিলানী (রহি:)।
২০। গুনিয়াতুত্তালিবিন -শাইখ আব্দুল কাদির জিলানী (রহি:)।
২১। মহিলা বিষয়ক হাদিছ সংকলন -মুয়াল্লিমা মোরশেদা বেগম, পিস পাবলিকেশন।
২২। মুসনাদে আহমাদ -ইমাম আহমদ বীন হাম্বল (রহি:)।
২৩। মিনহাজুল আবেদীন -ইমাম গাজ্জালী (রহি:), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
২৪। তারিখে হিন্দ -আবু সালেহ সিরহিন্দী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

পাঠকের মন্তব্যঃ

___...

আখীরুজ্জামান গবেষণা কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত আরো বইসমুহঃ

- ইমাম মাহমুদের ঐক্যের ডাক।
- গাজওয়াতুল হিন্দ এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা।
- আখীরুজ্জামান গবেষণা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।
- ইলহামী ভবিষ্যৎবানী (কাসিদা ও আগামী কথন)।
- গাজওয়াতুল হিন্দ -কড়া নাড়ছে আপনার দুয়ারে।
- কি হয়েছিল সেইদিন? -আবু উমার।
- আপনার যাকাতে যাদের হক রয়েছে।